# স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ২১ সংখ্যা।। ১৪ জানুয়ারি - ২০১৩।। ২৯ পৌষ - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা


## পরিবেশ বাঁচাও

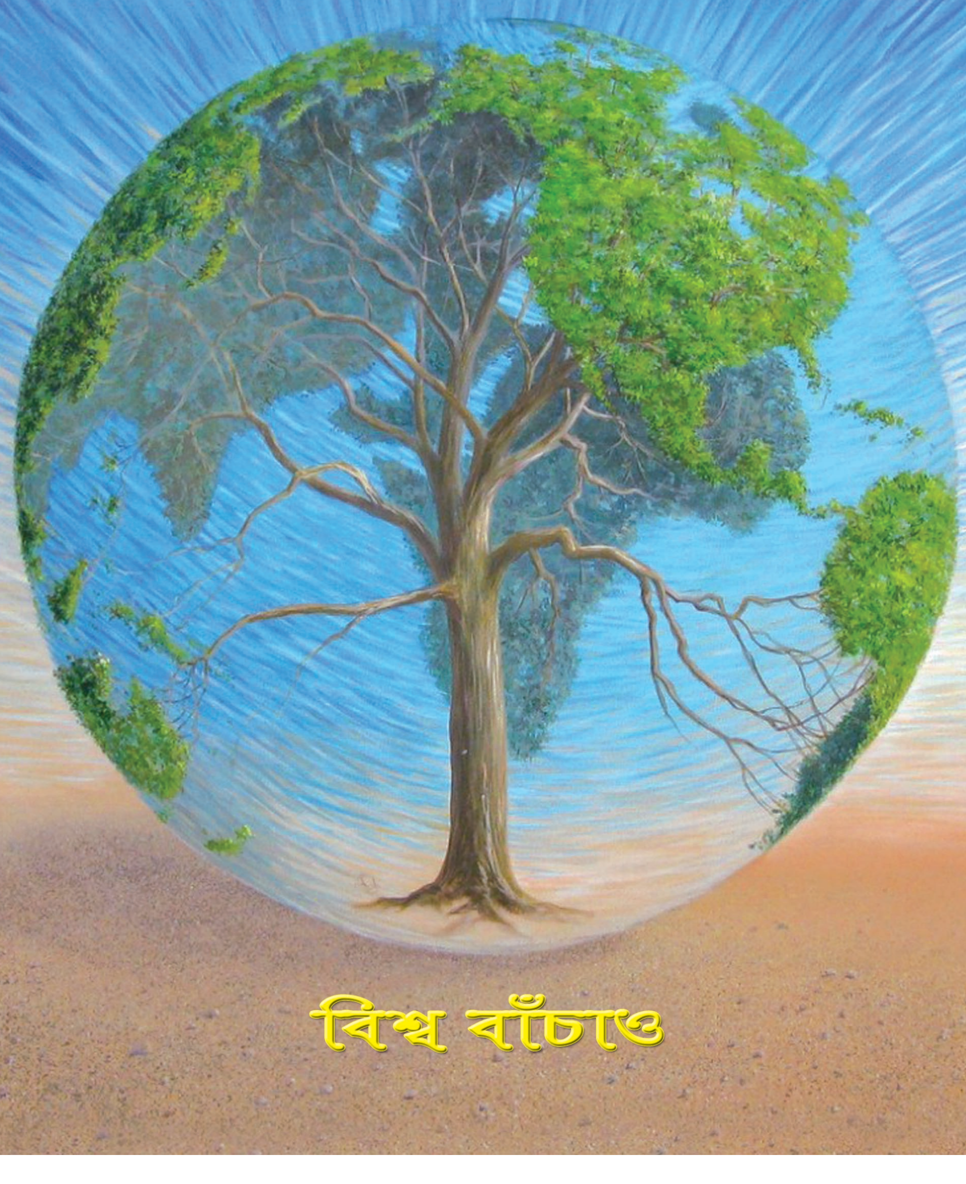

## বিশ্ব বাঁচাও

# সূচীপত্র


সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

সেনাবাহিনীর প্রচ্ছন্ন মদতে সিয়া মুসলিমদের
গণহত্যা চলছে পাকিস্তানে □ ৯

টাটাদের শর্তেই সিঙ্গুর মামলা মেটাতে চাইছে মমতা সরকার? □ ১০

মেগালোম্যানিয়াক মমতা □ অমলেশ মিশ্র □ ১১

দোহার জলবায়ু সম্মেলন থেকে কারও বিশেষ কোনও
প্রত্যাশা নেই □ ১৪

'দোহা' বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন : ইউরো-মার্কিন
দাদাগিরির আর এক দৃষ্টান্ত □ এন সি দে □ ১৫

বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে সামুদ্রিক অণুবীক্ষণিক উদ্ভিদের
ভূমিকা □ শুভস্মিত সিংহ □ ১৭

ভারতে নারীত্ব সাধনার পরম্পরা □ রবীন সেনগুপ্ত □ ২১

চেঁচুয়া-গোবিন্দপুর রাধাগোবিন্দ মন্দির □ ডঃ প্রণব রায় □ ২২

মকর সংক্রান্তি □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২৩

খোলা চিঠি : যাহাই বারো, তাহাই তেরো □ সুন্দর মৌলিক □ ২৭

ভারতে হিন্দুত্বকে উৎখাত করতে তৎপর ইউ পি এ □ জে জি অরোরা □ ২৮

শিলচরে আর এস এসের রাষ্ট্রজাগরণ শিবির : ধর্ষণ ঘটে
ইণ্ডিয়ায়, ভারতে নয় : ভাগবত □ ৩০

সরকারি উদাসীনতায় গুরুত্ব হারাচ্ছে মালদার
পাতালচণ্ডী □ তরুণ কুমার পণ্ডিত □ ৩১

ক্ষমতার স্বার্থে জামায়াত এখন নিজেদের গঠনতন্ত্র বদলাচ্ছে □ ৩২

চা-বাগানে রাম-রামায়ণ-রামশিলা □ বাসুদেব পাল □ ৩৬


## নিয়মিত বিভাগ


প্রাসঙ্গিকী : ১৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □
অঙ্গনা : ২৬ □ □ অন্যরকম : ৩৩ □ □ সুস্বাস্থ্য : ৩৫
□ □ সমাবেশ সমাচার : ৩৮ □ □ খেলা : ৩৯ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১



সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ২৯ পৌষ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ১৪ জানুয়ারি - ২০১৩

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।


ফঃ ১

## প্রচ্ছদ নিবন্ধ

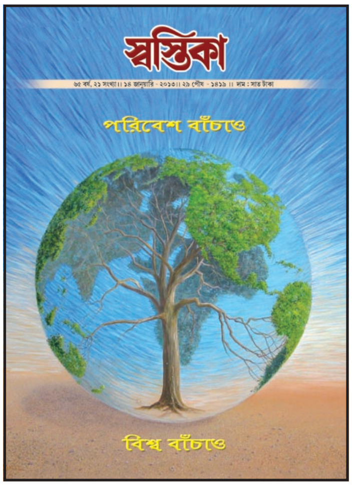


পরিবেশ বাঁচাও, বিশ্ব বাঁচাও - পৃঃ ১৪-১৮


স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬
হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

**Postal Registration No.-**
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

Ori Plast
P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes
Authrorised Distributor :
NATIONAL PIPE & SANITERY STORES
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174
PARTHA SARATHI CERAMICS
4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

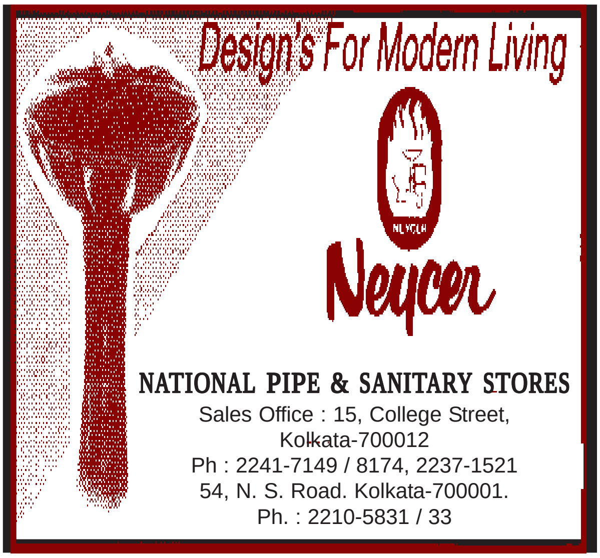
Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 15, College Street,
Kolkata-700012
Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521
54, N. S. Road. Kolkata-700001.
Ph. : 2210-5831 / 33

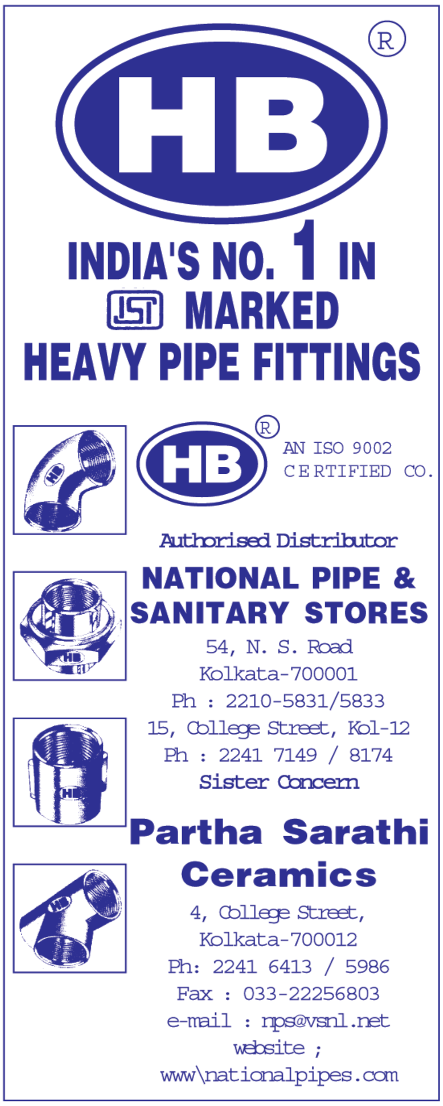
HB
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

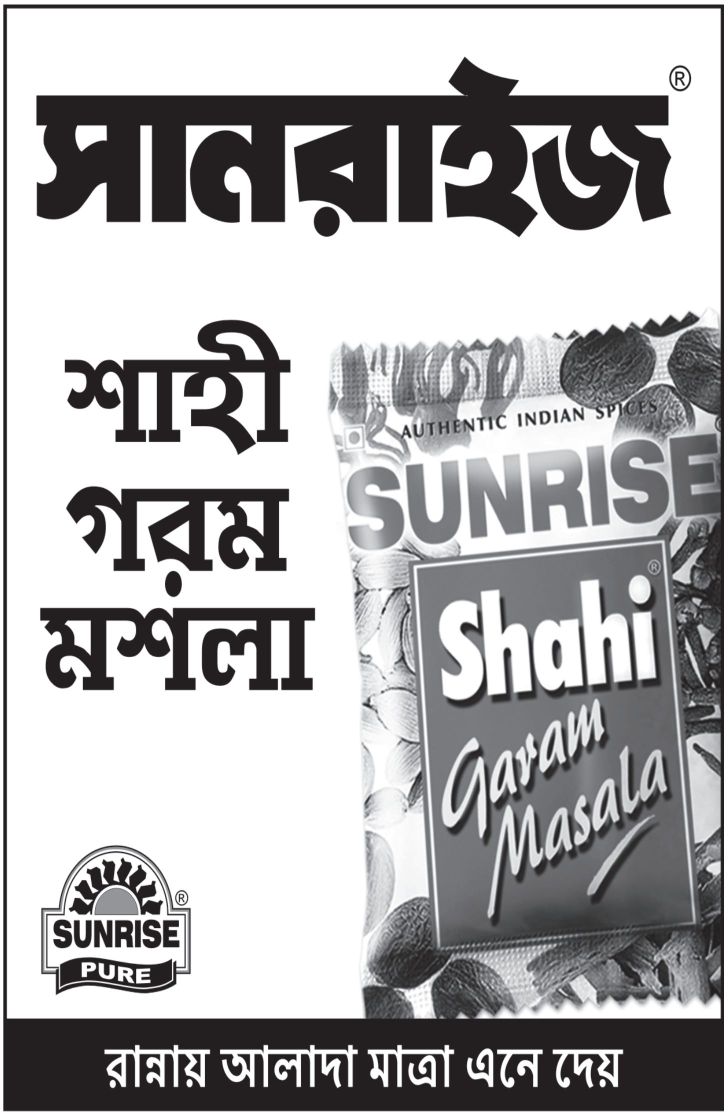
সানরাইজ
শাহী
গরম
মশলা
AUTHENTIC INDIAN SPICES
SUNRISE
Shahi
Garam Masala
SUNRISE
PURE
রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## বিড়াল তপস্বী

দেশের আর্থিক সংকটজনক পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার যখন পেট্রোল, গ্যাস, সার ইত্যাদির ভরতুকি তুলিয়া দিতে তৎপর, গত এক দশকের মধ্যে যেখানে সর্বনিম্নে রহিয়াছে আর্থিক বৃদ্ধি, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি (সি এ ডি) সামলাইতে থই পাইতেছে না কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক, তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিরাপত্তার নামে ও বিদেশ ভ্রমণে রাশি রাশি খরচ করা হইতেছে কেন? যে দেশ এখনও শিশুমৃত্যু, দারিদ্র্য ও অপুষ্টিতে বিশ্বের প্রথম দশটি দেশের মধ্যে অন্যতম, সেই দেশের সরকারের এই বিলাসিতা বোধবুদ্ধিহীনতার নামান্তর। বস্তুত প্রদীপের তলার এই অন্ধকার হারাইয়া গিয়াছে ইউ পি এ সরকারের জাঁকজমকে। ২০১১-১২ সালে মন্ত্রিসভার পিছনে খরচের পরিমাণ বাড়িয়াছে ৫০ শতাংশ। সম্ভাব্য খরচ ১৪৫০ কোটি টাকা ছাড়াইয়া খরচ হইয়াছে ১৫৫০ কোটি টাকা। আলাদা ভাবে নিরাপত্তার জন্য খরচ করা হইয়াছে ৬০০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ইহার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর খরচ ধরা হয় নাই। কেবল প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের জন্যই খরচ ছাড়াইয়া গিয়াছে ১১০০ কোটি টাকা। আলাদাভাবে তাঁহার নিরাপত্তার জন্যই খরচ হইয়াছে ৫৫০ কোটি টাকা। অথচ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কী হাল তাহা দিল্লীর একটি ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গও ইহার ব্যতিক্রম নহে। রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র, মানুষের নিরাপত্তার অবস্থা একই রহিয়াছে। খুন ডাকাতি ধর্ষণ ক্রমবর্ধমান। ২০১১-১২ বর্ষে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের বিদেশযাত্রা খাতে খরচ হইয়াছে প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা। যদিও ইহার সঙ্গে সরকারি সম্পত্তি ব্যবহার করিবার খরচ যোগ করিলে প্রকৃত অঙ্ক আরও অনেকটা বাড়িয়া যাইবে। কেবল প্রধানমন্ত্রীর একটি বিদেশ ভ্রমণের জন্য খরচ হইয়া থাকে কয়েকশো কোটি। ২০১২ সালে মন্ত্রী আমলাদের বিদেশ ভ্রমণ খাতে খরচ হইয়াছে ৯০০ কোটি টাকা। ইহার পর দলের সভানেত্রী তথা দলের অন্তরাত্মার বিদেশ ভ্রমণ ও চিকিৎসা খরচের প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হইলে পূর্বের সব সরকারের খরচের রেকর্ড ভাঙিয়া নতুন বিশ্ব রেকর্ড হইবে। ইহার পরও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যখন বলিয়া থাকেন, 'টাকা কি গাছে ফলে' তখন তাহা ভণ্ডামি বলিয়াই মনে হইতে পারে। গত এক বৎসরে প্রভূত সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সম্পদ প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। বর্তমানে তাঁহার সম্পত্তির মূল্য ১৭.৭৩ কোটি। গত বছরে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত সম্পদের পরিমাণ ছিল ৫.১১ কোটি। মন্ত্রীদের মধ্যে বিত্তের অঙ্কে প্রথম সারিতে রহিয়াছেন প্রফুল্ল প্যাটেল। তাঁহার সম্পত্তির মূল্য ৫২ কোটি। টেলি-যোগাযোগ মন্ত্রী কপিল সিব্বলের রহিয়াছে ৩৭ কোটি। তাঁহার স্ত্রীর সম্পদের মূল্য ৮ কোটি। ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রী স্টেট ব্যাঙ্কের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে প্রায় তিন কোটি টাকা বিনিয়োগ করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী ১৫০.৮০ গ্রাম সোনার গহনার অধিকারী। তাঁহার চণ্ডিগড় ও দিল্লীর ফ্ল্যাটগুলির বর্তমান মূল্য ৭.২৭ কোটি। অসমের ডিসপুরে একটি ব্যাঙ্কেও তাঁর প্রভূত অর্থ রহিয়াছে। টাকা যে আসলে কোনও গাছে ফলিয়া থাকে তাহা প্রধানমন্ত্রী ভালোভাবেই বুঝিয়াছেন। ভারতীয় গণতন্ত্রের দুর্ভাগ্য ইঁহারাই দেশের মানুষের হর্তা-কর্তা বিধাতা। দুর্নীতির ধ্বজাধারিরাই সততার নামাবলি গায়ে জড়াইয়া জ্ঞান বিলাইতেছেন। ধর্ষণে অভিযুক্ত সাংসদেরাই ধর্ষণের বিরুদ্ধে নাকি আইন তৈরি করিবেন! ইহাদিগকে বিড়াল তপস্বী ব্যতীত আর কী বলা যাইবে।

## জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

*"আমার কার্যপ্রণালী, হিন্দুদের দেখান যে তাহাদের কিছুই ছাড়িতে হইবে না, কেবল ঋষি প্রদর্শিত পথে চলিতে হইবে ও শত শত শতাব্দী ব্যাপী দাসত্বের ফলস্বরূপ এই জড়ত্ব দূর করিতে হইবে। অবশ্য মুসলমানগণের অত্যাচারের সময় আমাদের উন্নতি বন্ধ হইয়াছিল, তাহার কারণ তখন ছিল জীবন মরণের সমস্যা, উন্নতির সময় ছিল না। এখন আর সেই অত্যাচারের ভয় নাই, এখন আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতেই হইবে— স্বধর্মত্যাগী ও মিশনারীগণের উপদিষ্ট ধ্বংসের পথে নয়, আমাদের নিজেদের ভাবে, নিজেদের পথে। প্রাসাদের গঠন অসম্পূর্ণ বলিয়াই উহা বীভৎস দেখাইতেছে। বহু শত শতাব্দীর অত্যাচারে প্রাসাদ-নির্মাণ বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। এখন নির্মাণ কার্য শেষ করা হউক, তাহা হইলে সবই যথাস্থানে সুন্দর দেখাইবে। ইহাই আমার কার্যপ্রণালী। এবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই"।*

*—স্বামী বিবেকানন্দ।*

# সীমান্তে অনুপ্রবেশ রুখতে চিলি বোম্ব

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ওপার থেকে অনুপ্রবেশ ও অন্যান্য চোরা-কারবার রুখতে এযাবৎ উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ ও ২৪ ঘণ্টা নজরদারি করে এসেছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)। বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশের চেষ্টা ও অন্যান্য অপরাধ রুখতে সম্প্রতি বিএসএফ নতুন ফলপ্রসূ একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। অপরাধীদের হতবুদ্ধি করতে পারে এমন স্টান গ্রেনেড ও চিলি (লঙ্কা) বোম্ব বিএসএফ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর ব্যবহার করছে। বিএসএফের এক উচ্চপদস্থ অফিসার একথা জানিয়েছেন।

স্টান গ্রেনেড প্রাণঘাতী অস্ত্র নয় কিন্তু শত্রুপক্ষকে কিছু সময়ের জন্য হতচেতন করে রাখতে পারে। কোনও স্থায়ী ক্ষতি না করে এটা প্রচণ্ড আলোর ঝলকানি ও প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। এই বিস্ফোরণের শব্দে কিছুদিনের জন্য কানে শুনতে পাওয়া যাবে না কিংবা কান দিয়ে রস নিঃসৃত হবে যা মানসিক ভারসাম্যকে সাময়িকভাবে বিচ্যুত করে। বিএসএফ গত এক বছর ধরে এই নতুন কৌশলটি প্রয়োগ করে আসছে এবং অন্যান্য অস্ত্রের তুলনায় এটা যে অধিক উপযোগী তা বুঝতে পেরেছে। গত এক বছরে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে বিএসএফ অনুপ্রবেশকারীসহ ১২৭ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে। বিশেষত ভারত থেকে গোরু পাচারের ক্ষেত্রে এই অস্ত্রটি খুবই উপযোগী বলে বিএসএফের এক অফিসার জানিয়েছেন। স্টান গ্রেনেড অনেকটা টিয়ার গ্যাস সেলের মতো। এটার দ্বারা কেউ আঘাত পেলে মৃত্যু হবে না বটে, তবে ঘণ্টাখানেকের জন্য সে দেখতে পাবে না। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার মুসলিম তোষণে এতটাই তৎপর যে দেশের শত্রুদের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রের ক্ষেত্রেও লাগাম পরাতে চায়।

## মাদ্রাসা বোর্ডের আপত্তিতে সিলেবাসে ধাক্কা খেল মূল্যবোধের শিক্ষা

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** ন্যাশনাল কারিক্যুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ২০০৫-এর নির্দেশিকা মেনে রাজ্যের প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম পর্যালোচনা ও নতুন পাঠক্রম তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। কয়েকটি শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের পর সরকারিভাবে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে বই সরবরাহ করা হয়েছে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, রাজ্য-সরকারের মনোনীত সিলেবাস কমিটির সদস্যরা অনেকেই সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখে হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী, গল্প বা প্যারাবলস্ অফ শ্রীরামকৃষ্ণ জাতীয় রচনা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব এলেও তা বাতিল করতে হয়েছে। জানা গেছে মাদ্রাসা বোর্ডের তীব্র আপত্তি নাকি এর মূল কারণ। এমনকি মাধ্যমিক স্তরে কয়েক বছর আগে পাঠ্য প্যারাবলস্ অব গুড সামারিটান বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দীর্ঘদিনের পাঠ্য বিশপস্ ক্যান্ডলস্টিকস নাটকটিও এই কারণে বাদ গেছে। মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে সাহিত্যের বিষয়সূচীর অন্তর্ভুক্ত গল্প-কবিতা-নাটক অত্যন্ত সদর্থক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সরকারের সংখ্যালঘু তোষণনীতির ফলে মারাত্মকভাবে ধাক্কা খেল মূল্যবোধের শিক্ষানীতি।

## দিনাজপুরের সীমান্ত জুড়ে চোরাচালানকারীদের দৌরাত্ম্য

**অজয় সরকার : বালুরঘাট ॥** সীমান্ত এলাকায় বি এস এফের নজরদারি ও স্থানীয় প্রশাসনের হাজারো কড়াকড়ি ও প্রচার সত্ত্বেও চোরাকারবারিদের দৌরাত্ম্য কম করা সম্ভব হয়নি। প্রতিবছরই উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে পাচার। মাঝেমধ্যে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে পাচারকারীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। সংঘর্ষের ফলে গ্রামবাসীরাও মাঝেমধ্যে আহত হচ্ছে। পাশাপাশি গোরু পাচারের ফলে গ্রামবাসীর ফসলেরও ক্ষতি হচ্ছে। চোরাকারবার বন্ধ না হওয়ার কারণে সীমান্তে পাচার রুখতে গ্রাম্য হাট করে বৈধ কেনাবেচার ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানালেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মালদা ডিভিশন রেঞ্জের আই জি কুলদীপ কুমার শর্মা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা ২৫২ কিলোমিটার যার মধ্যে ৩৮ কিলোমিটার বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে দীর্ঘ এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া না থাকার ফলে চোরাকারবারীরা অতি সহজেই বিভিন্ন দ্রব্য পাচার করে থাকে। গবাদি পশু থেকে লবণ, চিনি, বিভিন্ন জীবনদায়ী ওষুধ পাচারকারীদের মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্রমাগত চলে যাচ্ছে। ফলে সরকারের প্রাপ্ত রপ্তানি করে ফাঁকি পড়ছে। আই জি কুলদীপ কুমার শর্মা জানান, প্রাথমিক ভাবে মালদা, রায়গঞ্জ ও দক্ষিণ দিনাজপুর সীমান্ত অঞ্চলে সরকারি ব্যবস্থাপনায় চারটি বড় হাটের কথা ভাবা হয়েছে। সীমান্ত দিয়ে চোরাপথে যে সমস্ত জিনিস বেশি পাচার হয় সেগুলিকেই হাটে কেনা-বেচার জন্য প্রাধান্য দেওয়া হবে। তবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক জানান সীমান্তে হাটের কোনও কথা তাঁর জানা নেই।

# এ রাজ্যে সিমি-মাওবাদী যোগাযোগ মজবুত হচ্ছে

**নিজস্ব সংবাদদাতা॥** সিমি, লস্কর-এ-তৈবা ও হরকত উল জিহাদই ইসলামি অর্থাৎ হুজির সঙ্গে এ রাজ্যের হাত মেলাল মাওবাদীরা। সম্প্রতি এই বিষয় নিয়ে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরকে সতর্ক করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে সঙ্গে যেসব স্থানে এই মুহূর্তে সিপিএম দল দুর্বল তারাও এই অশুভ গাঁটছড়ায় অংশ নিচ্ছে, না হলে সাহায্য করছে। এ রাজ্যে মাওবাদীদের শীর্ষনেতা কিষেণজীকে মেরে

*সিমি নেতা সাফদার নাগোরি*

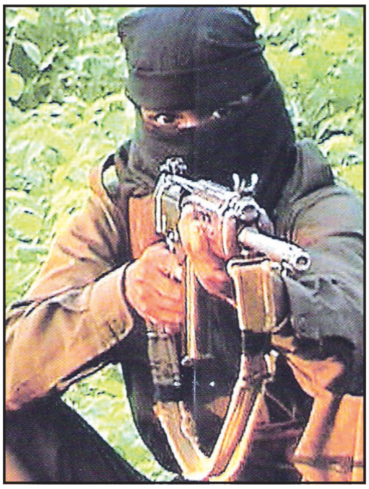

*মাও-নিশানা*

ফেলার পর জঙ্গলমহল অনেকটাই শান্ত হয়ে যাওয়াতেই মরিয়া হয়ে উঠেছে মাওবাদীরা। আবার ক্ষমতা হারানোর পর অনেক স্থানে তৃণমূলের প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় নানা কারণে সংগঠন ধরে রাখাই মুসকিল হচ্ছে মার্কসবাদীদের পক্ষে। মাওবাদীদেরও সংগঠনের অবস্থা তথৈবচ। তাই সংগঠন বাঁচাতে পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহল, বাঁকুড়া, বীরভূমের মতো উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতায়ও সিপিএম ও মাওবাদীরা বিভিন্ন বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য করেছে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে মাওবাদীরা আবার বাংলাদেশি মুসলিম মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন হরকত উল জিহাদই ইসলামি বা হুজি এবং লস্কর -এ-তৈবার ভারতীয় কম্যান্ডারদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। এই ব্যবস্থার ফলে এ রাজ্যের মাওবাদীদের সবচেয়ে বড় সুবিধে যেটা হচ্ছে তা হলো পশ্চিমবঙ্গসহ গোটা দেশে যেভাবে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে, তাতে অস্ত্রশস্ত্র ও টাকার জোগানে ঘাটতি পড়ছিল। হুজি বা লস্কর-এ-তৈবার সঙ্গে যৌথ অপারেশনে নামতে এই সমস্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হচ্ছে না। এই খবর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং 'এন আই এ'র রিপোর্টি জানার পর থেকেই নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের শীর্ষকর্তারা।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের মতে, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে জঙ্গলমহলের তিন জেলায় সাধারণ মানুষের অনুন্নয়নের মতো ইস্যুকে সামনে রেখে মাওবাদীরা যেভাবে নিজেদের জনসমর্থন তৈরি করেছিল ঠিক সেই একই কায়দাতেই এ রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চারটি জেলার সংখ্যালঘু মুসলিমদের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে নতুন আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে মাওবাদীরা। এই কাজে তাদের প্রধান সহযোগী মার্কসবাদীরা। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে রেজ্জাক মোল্লা এক প্রস্থ বৈঠক করেছেন সিদ্দিকুল্লার সঙ্গে। মুসলিম মোর্চার কথাও বলা হচ্ছে। তবে রেজ্জাক মোল্লা, সিদ্দিকুল্লা, মাওবাদী মার্কসবাদীরাই নয়, নতুন গড়ে ওঠা এই ফ্রন্টে রয়েছে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর প্রত্যক্ষ মদতও। প্রসঙ্গত চলতি বছরেই কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে অন্তত তিনজন হুজি শীর্ষনেতা গ্রেফতার হওয়ার পরে এ রাজ্যে হুজি ও লস্কর-এ-তৈবার মতো জঙ্গি সংগঠনগুলির অতি-তৎপরতা নিয়ে ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন গোয়েন্দারা। হুজি এবং লস্কর-এ-তৈবার পরিকল্পনা হলো আগামী এক বছরের মধ্যে মুর্শিদাবাদ এবং মালদা জেলাকে কব্জায় আনা। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ চলছে জোর কদমে। প্রত্যহই জাল নোটসহ নানা কারবার চলছে মালদায়। মুর্শিদাবাদকে ইতিমধ্যেই হিন্দুশূন্য করা গিয়েছে এবং যে সমস্ত স্থানে হিন্দুরা এখনও রয়েছে সেই সমস্ত স্থানে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে বেশি ধর্ষণের সংখ্যা এই জেলায়। গত পাঁচ বছরের হিসেবে— ২০০৮-এ ৩০৮ জন, ২০০৯-তে ৫৬৮, ২০১০-এ ৫২৬ জন এবং ২০১১-তে ৪৩৩ জন। ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত এই সংখ্যা ২৪৯-এ পৌঁছেছে। এই ধর্ষণকৃত মহিলাদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু বাড়ির মেয়ে-বৌ। হিন্দু বাড়ীতে ডাকাতি, লুঠপাঠ এবং হিন্দু মন্দির ভাঙচুর এই জেলায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এর ওপর যদি মাওবাদী উৎপাত আরও হয় তাহলে তা অতি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

সংবাদ প্রতিবেদন

# নির্বাচনের কাজে লাগানো কালো টাকা উদ্ধারে শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** গত পাঁচ বছরে নির্বাচনের কাজে লাগানো সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কালো টাকা উদ্ধারের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে উত্তরপ্রদেশের নাম। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে গত পাঁচ বছরে এই রাজ্য থেকে নির্বাচনের কাজে খরচ করা ৩৯ কোটি কালো টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় নামটি যথাক্রমে তামিলনাড়ু ও পাঞ্জাবের। ওই দুটি রাজ্য থেকে যথাক্রমে ৩৬.৫৪ কোটি ও ১১.৫৪ কোটি কালো টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তালিকার পরবর্তী নামগুলি হলো পশ্চিমবঙ্গ (৮.৫৪ কোটি), অসম (২.২৪ কোটি), গুজরাট (২.১৮ কোটি), উত্তরাখণ্ড (১.৩০ কোটি), কেরল (১.১৪ কোটি), মণিপুর (১.০৮ কোটি)। সব মিলিয়ে ভারতের নির্বাচন কমিশনের হিসেবে সারা দেশ থেকে নির্বাচনের কাজে লাগানো উদ্ধারকৃত কালো টাকার পরিমাণ ১০৪ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। তথ্য জানার অধিকার আইনে হাতরাস নিবাসী সমাজকর্মী গৌরব আগরওয়াল এই তথ্য জানাতে চাইলে, নির্বাচন কমিশন উপরোক্ত তথ্যসমূহ জানায়। নির্বাচক-মণ্ডলীকে যে পরিমাণ অর্থের টোপ দেখিয়ে ভোটবাক্সে তাদের মত বদলের প্রচেষ্টা হয়েছিল, তারই সমীক্ষার ভিত্তিতে এহেন পরিসংখ্যান বলে নির্বাচন কমিশনের তরফে উল্লেখ করা হয়েছে।

মায়াবতী

মুলায়ম

২০০৯-এ দেশে সাধারণ নির্বাচনের সময় বিপুল পরিমাণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হলে পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে নির্বাচন-প্রার্থীদের খরচের ওপর নজরদারির সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। ২০১০-এ বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকে এই নজরদারি শুরু হয়। পুলিশ কিংবা সংশ্লিষ্ট বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশী চালিয়ে এই টাকাগুলি উদ্ধার করেছেন। শ্রী আগরওয়ালের বক্তব্য, ‘‘আমি অনুরোধ করেছিলাম নির্বাচন কমিশনের কাছে গত পাঁচ বছরে নির্বাচনের কাজে লাগা সমস্ত কালো টাকার হিসেবে যেন তাঁরা উল্লেখ করেন। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে ২০০৯-এ লোকসভা নির্বাচনে যে বিপুল কালো টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত হিসেবের মধ্যে তা অবশ্যই রয়েছে।’’

# জার্মানীতেও জেহাদীদের নখদন্ত বিস্তার

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** গত ২০১২-র ২৪ ডিসেম্বর বছর চব্বিশের এক ভারতীয় যুবক জার্মানীতে আক্রান্ত হয়েছে। জার্মান পুলিশ এটাকে ইসলামিক আক্রমণ বলে অভিহিত করেছে। ছাত্রটি এখন সুস্থ হয়ে উঠছে এবং শীঘ্রই আগের মতো সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবে বলে জার্মানীর বন শহরের পুলিশ জানিয়েছে। তবে এখনও আক্রমণকারী দু'জনকে খুঁজে পায়নি। পুলিশ মনে করে আক্রমণকারীরা ইসলামিক র‍্যাডিক্যাল সংগঠনের সদস্য হবে।

আক্রান্তকারী জানায় ক্রিসমাসের প্রাক্কালে সে যখন পাবের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল তখন দুজন যুবক তার কাছে আসে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলে। যুবকটি এতে অস্বীকার করে। তখন ওই দুই যুবক তার নলি কেটে ফেলার হুমকি দেয়। তাতেও সে ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করে। ওই দুই যুবকের হাত থেকে সে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে। তখন তারা পিছন থেকে ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দেয়। তার গলায় ছুরি চালাতে থাকে এবং যুবকটির জিভ কেটে নেয়। একজন পথিক পুলিশ স্টেশনে খবর দেয়, পুলিশ অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে যায় এবং ছেলেটিকে উদ্ধার করে। পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ মুখপাত্র উভয়েই ছেলেটির পরিচয় দিতে অস্বীকার করেন। জার্মানী ইসলামিক আক্রমণের শিকার হতে চলেছে। ইতিমধ্যে জার্মান পুলিশ জেহাদীদের দুটি রাসায়নিক আক্রমণ বানচাল করে দেয়। জেহাদীদের পরিকল্পনা ছিল বন শহরে রাসায়নিক আক্রমণ চালানোর। দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই দু'জনের একজন গাজা ও অন্যজন লেবাননের।

২০১১-র এপ্রিল মাসে জার্মান পুলিশ তিনজন ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করে। জার্মানীতে প্রায় ১ হাজার আতঙ্কবাদী লুকিয়ে আছে বলে বিশ্বাস করে জার্মান গোয়েন্দা সংস্থা। জার্মান গোয়েন্দা সংস্থা জানিয়েছে, ১৯টি ইসলামিক গ্রুপের প্রায় ৩৪০০০ হাজার সদস্য হয়েছে। তারা জার্মানীতে শরিয়তী আইন চালু করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ইন্টারনেটে তাদের জেহাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ১৯ বৎসর বয়সী হ্যারি মাচুরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু জার্মান সরকার তাকে জেহাদী ওয়েবসাইট চালানোর অপরাধে গ্রেপ্তার করে। জার্মান সরকারের কঠোর মনোভাবের জন্য অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আছে জেহাদিরা।

# সেনাবাহিনীর প্রচ্ছন্ন মদতে সিয়া মুসলিমদের গণহত্যা চলছে পাকিস্তানে

গূঢ়পুরুষের ◻ কলম

পাকিস্তানে রীতিমতো পরিকল্পনা করেই শাসন ক্ষমতায় থাকা গোঁড়া সুন্নি মুসলমানরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনকে খতম করছে। কথাটা আমার নয়। গত ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদনে এই অভিযোগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পাকিস্তানে ২০১১ সালে মহরমের শোক-মিছিলে যোগ দেওয়ার 'অপরাধে' ৩৮৯ জন সিয়া সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা করেছে সুন্নি জেহাদিরা। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর গত ৮ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দফতরের সামনে সিয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন সমবেত হয়ে আওয়াজ তোলেন যে পাকিস্তানে রীতিমতো গণহত্যা চলছে। সবচেয়ে করুণ অবস্থা 'হাজারা' সম্প্রদায়ের মুসলমানদের। পাকিস্তানে 'হাজারা', 'আহমদিয়া', 'সিয়া' মুসলমানদের কাফের বলে চিহ্নিত। তাদের হত্যা করাটা পরম পুণ্যের কাজ বলে মনে করে সুন্নি জেহাদিরা। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে এমন একটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে। গত ২০১১ সালের শেষদিকে পাকিস্তানের কারাকোরাম হাইওয়ের উপর উগ্রপন্থীরা পাক সেনার পোশাক পরে বেশ কয়েকটি যাত্রীবাহী বাস থেকে যাত্রীদের নামিয়ে তল্লাসি চালায়। তারা জামা খুলে দেখে নেয় কার কার পিঠে মহরমের ক্ষতচিহ্ন আছে। তারপর সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে শতাধিক মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বিদেশী সংবাদসংস্থাগুলি সারা বিশ্বের সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে দেয়। ভারতের সংবাদমাধ্যম এই ঘটনাটি চাপা দেয়। যুক্তি দেখানো হয় যে খবরটি প্রকাশিত হলে ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নাকি নষ্ট হবে। ঠিক এই যুক্তিতেই পাকিস্তানে হাতে গোনা যায় এমন কয়েক শত হিন্দু পরিবারের মানুষজনকে ২০১১ সালে ভিটেমাটি-ছাড়া করা হয়। কোনও রকমে প্রাণ নিয়ে তাঁরা রাজস্থান ও পাক সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় এলাকায় আশ্রয় নেন। গুজরাটে গোধরা কাণ্ডের জেরে রাজ্যের কয়েকটি জেলায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়। তখন ভারতীয় মিডিয়া প্রবল উৎসাহে বেছে বেছে মুসলিম শরণার্থীদের শিবিরে গিয়ে ছবি তোলে। প্রচার করে হিন্দুরাই একতরফাভাবে অত্যাচার চালিয়েছে। সেই মিডিয়া পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত সংখ্যালঘু হিন্দুদের আশ্রয় শিবিরে যাওয়ার প্রয়োজনই বোধ করেনি। এ এক নির্মম উদাসীনতা। পাক কিশোরী ইউসুফজাই মালালার উপর সুন্নি তালিবান জঙ্গীদের আক্রমণের ঘটনা নিয়ে মিডিয়ায় ঝড় বয়ে গেছে। অথচ পাকিস্তানে হিন্দু নিধন-বিতাড়ন নিয়ে ভারতীয় মিডিয়ায় সামান্যতম হেলদোল নেই। একবিংশ শতকের পাকিস্তানে হিন্দুর বাস প্রায় নেই বললেই চলে। যদি কোথাও দুই এক ঘর থেকেও থাকে তবে তা খড়ের গাদা থেকে ছুঁচ খোঁজার থেকেও কঠিন কাজ।

সিয়াদের মধ্যে যারা 'হাজারা' সম্প্রদায়ভুক্ত তাদের চিহ্নিত করা সহজ। কারণ, তাদের মুখের আদল মঙ্গোলীয়দের মতো। তাই সুন্নিদের আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হয় তারাই। পাকিস্তানে সক্রিয় বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠী বহুদিন ধরেই প্রচার চালাচ্ছে যে পাক সরকার সিয়াদেরও হিন্দুদের মতোই কাফের বলে ঘোষণা করুক। আন্তর্জাতিক চাপে পাক সরকার তা করতে পারছে না। সুন্নি জঙ্গিরা তাই সরকারের উপর ভরসা হারিয়ে এখন নিজেরাই কাফের নিধনে নেমে পড়েছে। গিলগিট, বালুচিস্তান, কোয়েটা, করাচি, রাওয়ালপিণ্ডি সর্বত্রই এই নারকীয় হত্যার অভিযান চলছে। পাকিস্তানে হিন্দুদের মতোই 'হাজারা' সিয়াদের ৯৯.৯০ শতাংশ পাক নাগরিক দেশত্যাগ করে ফিলিপাইন, তাইল্যান্ডে আশ্রয় নিয়েছেন। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ২০ শতাংশ মানুষ সিয়া মুসলিম। এই সংখ্যাকে ২ বা ৩ শতাংশে নামিয়ে আনাটাই সংখ্যাগুরু সুন্নিদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য। পাকিস্তানে সিয়া-সুন্নি লড়াই নতুন কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু সম্প্রতি সিয়া মুসলিমদের যেভাবে গণহত্যা চলেছে তার পিছনে আছে পাক সেনাবাহিনীর প্রচ্ছন্ন মদত। পাক সামরিক বাহিনীতে ৯৯ শতাংশ সেনাই সুন্নি মুসলমান। তাই সিয়াদের নিধনে পাক সেনাবাহিনীর উৎসাহের অন্ত নেই। সুন্নি জঙ্গিদের সামনে রেখে তারাই সিয়াদের খতম করার অভিযানে নেমেছে।

পাকিস্তানের মাটি থেকে হিন্দু ও সিয়াদের খতম করার পিছনে হাত আছে সৌদি আরবেরও। মনে রাখতে হবে, সৌদির তেল বেচার টাকার একটা বড় অংশ খরচ হয় পাকিস্তানের মাটিতে ঘাঁটি গেড়ে বসা সুন্নি জঙ্গিদের মদত দিতে। সৌদির ধনকুবের শেখদের টাকাতেই গড়ে উঠেছে ইসলামের আন্তর্জাতিক জেহাদি সংগঠনের নেটওয়ার্ক। সেখানে প্রাধান্য পায় সারা দুনিয়ার সুন্নিরাই। গণহত্যার মাধ্যমে পাকিস্তানকে সিয়া শূন্য করার ছক অবশ্যই নিন্দনীয়। তবে এর জন্য সিয়া সম্প্রদায়কেও আত্মসমালোচনা করতে হবে। এই সিয়া মুসলিমরাই একদা পাকিস্তানের সংসদে আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অ-মুসলিম বলে চিহ্নিত করার দাবিতে সরব হয়েছিল। সেই দাবি মেনে পাকিস্তানে আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অ-মুসলিম বলে চিহ্নিতও করা হয়েছে। খতম করাও হয়েছে। সেই পাপের দাম আজ সিয়াদের দিতে হচ্ছে।

রাজ্য রাজনীতি

# টাটাদের শর্তেই সিঙ্গুর মামলা মেটাতে চাইছে মমতা সরকার ?

**নিশাকর সোম**

এ রাজ্যের শাসকদলের জন্মদিবস আর ইংরাজি নববর্ষের সূচনার দিন একই। দেখা গেল মহাকরণে ১ জানুয়ারি উদযাপন! দেশের আর কোনও রাজ্যে সরকারি সদর দফতরে এই অনুষ্ঠান দেখা গেল না। এ

*বেচারাম মান্না*

*মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়*

রাজ্যের মহাকরণে ক্রিসমাস উৎসবও পালন হলো! সান্তাক্লজ সেজে তৃণমূলের অন্যতম মমতা-পন্থী শিল্পী শুভাপ্রসন্ন এলেন। তিনি বিলোলেন উপহার। বোধহয় তিনি উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রীকে ৩৪-৪৫ বছর শাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকার উপহার প্রদান করলেন।

তৃণমূলের জন্মদিন উপলক্ষে সমগ্র রাজ্যে কোনও রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়নি। পালিত হয়েছিল উদ্দাস-উল্লাসের উৎসব। কারণ তৃণমূল-এর কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচী নেই। তৃণমূল সৃষ্টি হোত না যদি না মমতা সোমেন মিত্রের নিকট প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদের নির্বাচনে পরাজিত না হতেন। তাইতো বহু নিন্দিত ভাঙড়ের অর্ধনগ্ন নারীদের উদ্দাম নৃত্য। এর উদ্যোক্তা হলেন তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সদস্য মীর তাহের আলি। এই নৃত্যের মাঝে টাকা ওড়ানো হয়েছে। আগের যুগের উচ্ছৃঙ্খল জমিদারদের মাইফেলে এরকম দেখা যেত। অবশ্য বামফ্রন্টের মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর উদ্যোগে সল্টলেকে 'হোপ এইট্টি সিক্স' অনুষ্ঠান হয় এবং মাথায় টুপি দিয়ে সারারাত এই অনুষ্ঠান দেখেন জ্যোতি বসু! হবে না কেন যেখানে রাজ্য সরকার মেলায়, উৎসবে বন্যার মতো লক্ষ কোটি টাকা খরচ করছে— সেখানে নিচের তলার কর্মীরা তো সেই পথেই যাবে। নানা উৎসবে প্রায় ১০০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার খরচ করেছে। তাহের আলিকে নাকি সাসপেন্ড করা হয়েছে। তিনি দলীয় কার্যালয়ে দলবল সমেত উপস্থিত থাকেন। তাহের আলি গোষ্ঠীকে আরাবুলের বিরুদ্ধে লাগাতে চাইছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

রাজ্যে শিল্পায়নের কোনও দিশা নেই। এর মধ্যে এবিজি সমস্যা বিদেশে পৌঁছে গেছে। তার ফলে বিদেশ মন্ত্রকের কাছে বিদেশি রাষ্ট্র থেকে বহু নালিশ জমা হয়েছে।

সিপিং কর্পোরেশন-এর সিএমডি সব্যসাচী হাজরা রাজ্যে লগ্নির পরিবেশ নিয়ে সরকারি ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্সের মহানির্দেশক প্রিয়রঞ্জন রায়ও রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা মন্ত্রীগণ সিঙ্গুর মামলার ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন না। মুখ্যমন্ত্রী তো সিঙ্গুরে মুখ দেখাতে চান না। তাই রাজ্যসরকার সিঙ্গুর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের কাছে সময় চাইলো। মামলা জুলাই মাস পর্যন্ত পিছিয়ে গেল। আইনজ্ঞ মহলের অভিমত সিঙ্গুরে রাজ্য-সরকার পরাজয়ের ভয়ে ভীত। সিঙ্গুর আন্দোলন সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যায় ২০০৬ সালের ২৫ মে সিঙ্গুরের উজ্জ্বল সংঘের ক্লাব সদস্যগণকে নিয়ে একদল কৃষক মহাদেব দাশের নেতৃত্বে গাড়ি আটক করে আন্দোলন শুরু করে। এটাই টাটাদের বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভ। এর আন্দোলনকারীরা স্থানীয় বিধায়ক রবীন ভট্টাচার্য-এর সাহায্য চান। তিনি রাজি হন। তাঁর নেতৃত্বে নানা ধরনের এমনকি মাওবাদী কর্মীদের নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। বুদ্ধদেব সরকার আলোচনার পথে না গিয়ে পুলিশি অভিযানের পথে গিয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন। সিঙ্গুর আন্দোলনের মাঝখানে কলকাতায় তথ্য কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন ভট্টাচার্যকে নিয়ে বুদ্ধবাবু ও নিরুপম সেনের সঙ্গে আলোচনার জন্যে যান। কিন্তু আলোচনাতে রবীন ভট্টাচার্যকে বাইরে বসিয়ে রেখে মমতা একাই আলোচনা করেন।

এরপর বেচারাম মান্না এগোলেন। গুজব তিনি নাকি বহু লক্ষ টাকা খরচ করে মন্ত্রিত্ব পেয়েই হম্বিতম্বি করছেন। আর রবীন ভট্টাচার্য রাজনীতি ছেড়ে দিতে চাইছেন। এখন নাকি ''টাটাদের শর্তেই'' সিঙ্গুর সমস্যা মেটাতে আগ্রহী পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

# মেগালোম্যানিয়াক মমতা

**অমলেশ মিশ্র**

আমার যদি চিত্রায়ণ বা চিত্রঅংকনের ক্ষমতা থাকত তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিত্র অংকন করে দেখতাম তিনি নিজে নিজেকে কীভাবে ক্রুশবিদ্ধ করছেন।

একটি কার্টুন করতে পারলেও হোত। কিন্তু মমতাদেবীর কার্টুনে ঘোরতর এলার্জি। বাঙ্গালীর উদ্যোগে সংবাদপত্রে প্রথম কার্টুন প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে। সংবাদপত্রের নাম--- অমৃতবাজার পত্রিকা। তারিখটা ছিল ২৮ ফেব্রুয়ারি। এখন ২০১৩ সাল। অর্থাৎ এ রাজ্যের সংবাদপত্রে কার্টুন প্রকাশের সার্ধশতবর্ষ পালনের সময় এসে গেছে— তবু কার্টুনে এলার্জি! অম্বিকেশ মহাপাত্রের কার্টুনে যে 'ফিনিশ' বলে ইংরাজী শব্দটি আছে, মমতাদেবী নিজমুখে (কোনও এক বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমে দেখাচ্ছিল) তার ব্যাখ্যা করেছেন যে ওই শব্দে ব্যবহার করে খোদ মমতাদেবীকেই 'ফিনিশ' করার ইঙ্গিত রয়েছে।

যদি বলি, মমতাদেবীর কার্টুনে এলার্জি রয়েছে তাহলে পুরোপুরি সত্য বলা হয় না। ওঁর বোধ হয় সব কিছুতেই এলার্জি। এর চিকিৎসা হয় কিনা জানা নেই। বোধহয় হয় না। কারণ মানসিক এলার্জির চিকিৎসা থাকলে মেগালোম্যানিয়াক চরিত্র সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল না। তীর্থযাত্রীরা বলেন— সব তীর্থ বার বার, সাগরতীর্থ একবার। পশ্চিমবঙ্গবাসীও হয়তো কোনও একদিন বলবেন— সব মুখ্যমন্ত্রী বার বার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একবার।

মেগালোম্যানিয়াক একটি ইংরাজী শব্দ। Megalomaniac- ম্যানিয়াক শব্দের সঙ্গে Mega যুক্ত হয়েছে মাত্র। ম্যানিয়াক শব্দটি আমাদের পরিচিত। বাতিকগ্রস্ত বা বাইগ্রস্ত। চুরি করার বাতিক, মহিলা সংক্রান্ত বাতিক এমনকি বই সংক্রান্ত বাতিক। ক্লেপ্টোম্যানিয়াক, নিম্ফোম্যানিয়াক, বিবলিওম্যানিয়াক প্রভৃতি আমাদের সুপরিচিত শব্দ। এইসব 'ম্যানিয়া' বা 'বাতিক' এর চিকিৎসা হয় বলে শোনা গেছে। কিন্তু

মেগালোম্যানিয়াক-এর চিকিৎসার কথা শোনা যায় না। শোনা যায় না বলে হবে না এমন নয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান নিশ্চয় মেগালোম্যানিয়াকদের কথা ভাবছেন। তবে এই ধরনের কেস আসে না বলেই হয়তো চিকিৎসাবিদরা বেশি ভাবিত নন।

এই মেগালোম্যানিয়া বা এই বাতিক-এর বঙ্গানুবাদ হলো— নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করার মানসিক বিকার, অস্বাভাবিক অহংমন্যতা।

মমতাদেবী হয়ত বিশ্বাস করেন যে ভূভারতে জীবিতদের মধ্যে কারুর কাছেই তাঁর শেখার বা জানার কিছু নাই। এমন কি তার প্রিয়পাত্র ইমামদের কাছ থেকেও নয়। আমরা শিখতে বা জানতে যাই তাদের কাছেই যাদের আমরা শ্রদ্ধা করি। এমন শ্রদ্ধার পাত্র যদি দেশে না থাকে তিনি শিখতে যাবেন বা জানতে যাবেন কার কাছে? তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সব বিষয়েই জানেন, শুধু জানেন নয়, শেষ কথাটিও জানেন।

অস্বাভাবিক অহংমন্যতার কারণে এরা হয়ে যান প্রদর্শনবাদী। আলুভাতে মাখার পরও বলবেন--- এই দেখে যা কেমন আলুভাতে মাখলাম। এই শুনে যা— কেমন বললাম। তাঁর আগে বা তাঁর সময়ে কেউ ওরকম আলুভাতে মাখতে পারেননি, কেউ এমন কথা বলতে পারেননি। অর্থাৎ 'বস্তু' (Substance/content)-র থেকে ঢং বেশি, চলতি কথায়— ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন বাইরে কোঁচার পত্তন। ঢেঁকি ফোঁপরা হলে শব্দ বেশি হবেই— বৈজ্ঞানিক কারণে।

মেগালোম্যানিয়াকরা ভাবেন— দুনিয়া ব্যাপী তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত হচ্ছে, তাঁকে/তাঁদের নিকেশ করার জন্য বহুজন আদা-জল খেয়ে লেগেছে। যেহেতু তাঁর/তাঁদের গুণপনা অন্যদের ম্লান করে দিচ্ছে তাই অন্যরা তার পিছনে লেগেছে।

ক্ষমতায় আসার পরে পরেই মমতাদেবী তাঁর অস্বাভাবিক অহংমন্যতার পরিচয় দিলেন (১) মন্ত্রিসভা গঠনে (২) ডাঃ গড়াই-এর মতো একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে অকারণ শাস্তি দিয়ে। এর আগেও এই অহংমন্যতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠনের সময় দেখা গেছিল। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শরিক হিসাবে দুইজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী পাওয়ার হকদার ছিল। কিন্তু মমতাদেবী কেবল নিজেকেই কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী করলেন। তার অস্বাভাবিক অহংমন্যতা তার দলের অপর কাউকে ওই পদের যোগ্য বলে মনে করেননি।

মন্ত্রিসভার ঘোষিত সদস্যদের উপর তাঁর কোনও বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা সম্ভবত ছিল না। তাই

গুরুত্বপূর্ণ ৯-১০টি মন্ত্রক নিজের হাতেই রাখলেন। অস্বাভাবিক অহংমন্যতা তাকে আশ্বস্ত করেছিল যে তিনি একাই পারবেন ৯-১০টি মন্ত্রক সামলাতে। সবগুলিই পারতেন তবে এতগুলি বিধায়ক কাউকে কাউকে মন্ত্রী না করলে চলে না। তিনি জানেন যে মন্ত্রক ভাগ করে দিয়ে মন্ত্রী বানানো নেহাৎই তার বদান্যতা। ওঁদের নিজস্ব কোনও আলো নাই। মমতার আলোতেই তাঁরা আলোকিত। পেপারওয়েট টেবিলের কোনও জায়গায় থাকবে তা টেবিল ব্যবহারকারীই স্থির করবেন। পেপারওয়েট নিজের খুশীমতো টেবিলে থাকতে পাবে না। কেউ কেউ বলেন যে ওই সরকারে কেবল একটাই পোস্ট, বাকিগুলি ল্যাম্পপোস্ট। ফলে প্রত্যেক মন্ত্রীই তাঁর নিজের দপ্তরের ব্যাপারে শেষ কথাটা কী হবে তা স্থির করতে কিংকর্তব্য বিমূঢ়। অনেক সময় বলে ফেলে ঢোক গিলে ফেলেন। এই মন্ত্রিসভায় গেয়েবেলস্ আছেন, রিবেনট্রপ নেই।

অস্বাভাবিক অহংমন্যতা এবং নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণার মনোবিকার এদের বিবেক বর্জিত, সাধারণ বুদ্ধি বিবর্জিত এবং সৌজন্যবোধ বিবর্জিত এক অসাধারণ অস্বাভাবিক চরিত্র তৈরি হয় এবং এই অসাধারণত্বেই লোভ এবং এইখানে পৌঁছানোর জন্য সকলকেই সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করেন। হয় আমার কথায় চলো, অন্যথায় মৃত্যুবরণ কর।

অস্বাভাবিক অহংমন্যতা ও প্রদর্শনকামীতার পরিণত রূপ দেখা গেল সিঙ্গুর আইন। (দি সিঙ্গুর ল্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাক্ট)। সিঙ্গুরের প্রতি দায়বদ্ধতায় প্রদর্শন করতে গিয়ে নূতন মন্ত্রিসভার প্রথম কাজ হলো— সিঙ্গুর আইন। এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, তিনি জানতেন যে এই আইনটি ধোপে টিকবে না তবু প্রদর্শনবাদীতার দায় পালন করতেই হবে। আবার এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় যে, আইনটি প্রণয়নের আগে তিনি কারুর সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজনই বোধ করেননি যেহেতু আইনের বিষয়ে তিনি সবই বোঝেন। আদালতের বিচারক বা সংবিধান ব্যাখ্যাকারীরা আইন বিষয়ে তার থেকে বেশি কিছু জানেন না। আর যদি জেনেও থাকেন তবু তাদের একথা জানতে হবে যে মমতা যা বলবেন সেটাই আইন। তার বাইরে কোনও আইন চলবে না। যদি তারা সেটা না বোঝেন তাহলে বুঝতে হবে যে তাদের রাজনীতি ও অর্থ দিয়ে বশীভূত করা হয়েছে যা নাকি তার 'সুশাসন'-কে ব্যর্থ করার চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র। প্রদর্শনবাদিতায় বস্তু থাকে কম ঢং থাকে বেশী। অনিচ্ছুক চাষীদের জমি ফেরত, ইমামদের ভাতা, রেলমন্ত্রী হিসাবে যাবতীয় প্রতিশ্রুতি, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শত শত ঘোষণা সবেতেই বস্তু কম ঢং বেশির উদাহরণ। ঘোষক বিলক্ষণ জানেন যে যা বলা হচ্ছে তা করা সম্ভব নয়, তবু বলতে হয় নিজের সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করার মানসিক বিকারের কারণে।

সারা পৃথিবীর কথা জানি না, ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলের (তৃণমূল ব্যতীত) বিভিন্নজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। কাউকে বলতে শোনা যায়নি যে 'এক বছরে দশ বছরের কাজ করে দিয়েছি।' রাজ্যসরকার দেড় বছর চালানোর পর কোনও মুখ্যমন্ত্রী বলেননি যে, "প্রতিশ্রুতির ৯৯ শতাংশ পূরণ করে দিয়েছি।" এই সব বিকারের প্রকাশ— যা মেগালোম্যানিয়াক-এর বৈশিষ্ট্য।

যে বিষয়টি তিনি নিজে বলবেন তিনি কেবল সেটিই মানবেন। অন্য কেউ আরও ভাল বা বিচক্ষণ কিছু বলতে পারেন— তা মেগালোম্যানিকরা মানবেন না, মানলে তার সেই অস্বাভাবিক অহংমন্যতায় আঘাত করবে। খুচরো ব্যবসায়ে সরাসরি বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ (এফ. ডি. আই) করায় সরকারি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মমতাদেবী নিজের দলের সাংবিধানিক অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তুললেন। মাত্র ১৯ জন সাংসদ নিয়ে এই কাজে তিনি এগিয়ে গেলেন অন্য কোনও দলের সঙ্গে আলোচনা না করেই। অন্যান্য দল যখন তার প্রস্তাব মানলেন না সঙ্গত কারণেই তখন মমতা দেবী তাদের দুয়ো দিলেন। অপরদিকে অন্য কয়েকটি কংগ্রেস বিরোধীদল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সংসদে ১৯৪ ধারায় আলোচনার প্রস্তাব করেন। মমতাদেবীর পক্ষে তা মানা সম্ভব হলো না— যেহেতু প্রস্তাবটি তার নিজের নয়। তার দেওয়া প্রস্তাবটিই (অনাস্থা প্রস্তাব) সকলের মানা উচিত ছিল বলে তার দাবী। অর্থাৎ তিনিই একমাত্র সঠিক পথ দেখিয়ে দিলেন। অস্বাভাবিক অহংবোধ-এর যে মানসিক বিকারটি তিনি নিজের মধ্যে তৈরি করেছেন এক্ষেত্রে তার আরও একটি বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল। তাঁর শেখার, জানার বা মেনে নেওয়ার কোনও দায়ই নাই। অন্যদেরই দায় মমতাদেবীর কথা বিনাপ্রশ্নে মেনে নেওয়ার।

মেগালোম্যানিয়াকরা মনে করেন যে তাঁরা কোনও ভুল বা ত্রুটি করতে পারেন না। তাই তাঁদের করা কোনও কাজে বা তাদের বলা কোনও কথায় কেউ যদি ভুল বা ত্রুটি দেখতে পান তা তাদের মানানো যায় না। দোষ অবশ্যই অন্যের, বেঠিক কিছু ঘটে থাকলে তা অন্যের কারণে হয়েছে— তাঁর বা তাঁদের কারণে হয়নি।

অস্বাভাবিক অহংমন্যতা ও নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করার মানসিক বিকারের কারণে এদের চরিত্র হয়ে যায় স্বৈরতান্ত্রিক। তাঁদের ভাবনা, চিন্তা, কাজ অন্য কারুর সঙ্গে তুলনীয় বলে তারা মনে করেন না। তাঁরা আদেশ করার জন্যই জন্মেছেন, আর তাঁদের আদেশ পালন করার জন্য অন্যদের জন্ম হয়েছে।

যদিও আমি নিজে কখনও ম্যারাথন দৌড়ে যোগ দিইনি তবে শুনেছি এই ধরনের লম্বা দৌড়ে প্রথমে দম রেখে অপেক্ষাকৃত ধীরে দৌড়াতে হয়। প্রথম থেকেই পুরো দম খরচ করে দৌড়ালে, দৌড় শেষ হওয়ার আগেই দম শেষ হয়ে যায়।

মেগালোম্যানিয়াকরা কখনও দৌড় শেষ করতে পারেন না। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করার মানসিক বিকার এবং অস্বাভাবিক অহংম্যনতার কারণে 'আমিই প্রথম হব— আমার থেকে বড় কে আছে?' ইত্যাদি ভাবনায় প্রথম থেকেই জোরে দৌড়াতে শুরু করেন। অচিরেই দম ফুরিয়ে যায়— তখন ভাবটা হয় ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। এরা সব সময়ই অসমাপিকা

ক্রিয়া— ইংরাজী ব্যাকরণে যাকে বলা যায় ইনফাইনিট ভাব। বাক্যগঠন করা যায় না। বাক্য অসম্পূর্ণ থাকে। প্রতিশ্রুতিতে দম ফুরোয়— দৌড় শেষ হয় না। কেন পারলেন না— জিজ্ঞেস করলে দোষটা অভ্যাসবশতঃ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। 'এটা যদি না হোত তাহলে আমি নিশ্চয় পারতাম'— ইত্যাদি অজুহাত।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের নির্বাচনের আগে মমতাদেবীর জানাই ছিল— রাজ্য সরকার কত ঋণ করেছে। যিনিই পুরাতনকে সরিয়ে নিজে ক্ষমতায় আসবেন--- তাঁকে আবশ্যিক ভাবে পুরানোদের দায়টুকু নিতেই হয়। এটাই আইন— এটাই নিয়ম। মমতাদেবী জানতেন যে, যে সরকারকে সরিয়ে তিনি নিজে নূতন সরকার গড়েছেন সেই সরকারের ঋণ। সরকারের দায়িত্ব নেওয়া মানে যেমন রাজস্ব সংগ্রহের অর্থ প্রাপ্তি হয়, তেমনি ঋণ বাবদ সুদের দায়ও নিতে হয়। রাজ্যই ঋণের দায়ে ডুবে আছে— এই রাজ্যকে নিলামে তুললেও কেউ নাকি কিনবে না। এই বক্তৃতায় এই রাজ্যের অসম্মান করা হয়েছে কি-না সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। আমি অতি সাধারণ বুদ্ধি ও অঙ্কের কথায় আসছি। এটা সকলেরই জানা এবং সেই কারণে মমতাদেবীরও জানা যে কোনও রাজ্য সরকার ইচ্ছামতো ঋণ করতে পারে না। প্রতিটি রাজ্যের জনসংখ্যা ও রাজস্ব আদায় ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তার ঋণ গ্রহণের ক্ষমতার সীমা আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে ক্ষমতা অতিক্রম তখনও করেনি যখন মমতাদেবী ক্ষমতায় এলেন। দ্বিতীয়ত এই রাজ্যের থেকেও বেশি ঋণ করেছেন এমন রাজ্য আছে। এবং সেই রাজ্যের প্রধানরা একথা ভাবেন না যে তাদের রাজ্যগুলি দেনার দায়ে নিলাম হয়ে যাওয়ার অবস্থায় এসে গেছে। তৃতীয়ত, ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণও কম নয়। ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যায় তুলনায় ভারত সরকারের ঋণ, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার নিরিখে এই সরকারের ঋণ কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণের অনুপাতে কম। চতুর্থত, আজকালকার অর্থনীতিতে ঋণ করতেই হয়। তবে ঋণ নিয়ে খেয়ে ফেললে মুশকিলে পড়তে হয়। মমতাদেবীর আগে সিপিএম বা তার আগে কংগ্রেস যখন এই রাজ্য চালিয়েছিলেন, তারাও ঋণ করেছিলেন। ভারত সরকার তার আয়ের যে শতাংশ সুদ বাবদ খরচ করেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুদ বাবদ ব্যয় সেই শতাংশের থেকে কম। তবু ভারত সরকার নিয়ে কোনও মন্ত্রী নিলামের প্রসঙ্গ আনেন না।

এগুলি খুব সাধারণ যুক্তি। মমতাদেবী বা তার অর্থমন্ত্রী এসব জানেন না এমন নয়। কিন্তু মেগালোমানিয়াকরা কখনও নিজের কোনও দোষ বা ত্রুটি আছে একথা ভাবতেই পারেন না, বিশ্বাস তো করেনই না। তাই যখন দম ফুরিয়ে যায় তখন পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজের দায় এড়ানো ব্যতীত তাদের মান রক্ষার উপায় থাকে না। এইজন্যই এরা অসমাপিকা ক্রিয়া।

কারা যেন বলছিলেন— মমতাদেবীকে পরামর্শ দেওয়ার কেউ নেই। অথচ মমতাদেবীর নাকি সুপরামর্শ প্রয়োজন। উনি পরামর্শটা নেবেন কার কাছ থেকে? ওঁকে পরামর্শ দেওয়ার কোনও লোক আছে বলে মমতাদেবী বিশ্বাস করেন না। সকলেই তাঁর আলোকে আলোকিত— সকলেই চামচ এবং মোসাহেব স্থানীয়।

মমতাদেবীর সঙ্গে ১৩ বছর রাজনীতি করেছেন এমন একজন ব্যক্তি, মমতাকে ত্যাগ করে অথবা এমনও হতে পারে যে মমতাদেবীই তাঁকে ত্যাগ করেছেন, একটি বই লিখেছেন। তাতে বহুবিধ প্রসঙ্গের মধ্যে একটি প্রসঙ্গ আছে। তিনি সেই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মমতাদেবী নাকি প্রচুর মিথ্যা কথা বলেন, সেই বইটির একটি অধ্যায় আছে ওই প্রসঙ্গে। মমতাদেবীকে অনেকেই মিথ্যাচারী বলেন। তাঁদের কথা তুলছি না কারণ মুখে অনেকেই অনেক কিছু বলেন। কিন্তু এই ব্যক্তি লিখিত ভাবেই বলেছেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইজ এ বর্ণ লায়ার। বইটি নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত হয়নি। তাই ওই বইটির কথা আনলাম। সেই ভদ্রলোক বোধহয় খেয়াল করেননি যে যাঁরা নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করার মানসিক বিকারে ভোগেন এবং অস্বাভাবিক অহংবোধে জর্জরিত থাকেন--- তাদের নিরন্তর মিথ্যা বলা ব্যতীত উপায় থাকে না। নিজের দোষ ত্রুটি (যা খুব স্বাভাবিক একজন মানুষের ক্ষেত্রে) যারা মানেন না, দেখেন না— তাদের অপর দোষ দেওয়া ব্যতীত উপায় থাকে না। ফলে মিথ্যাচার স্বাভাবিক এই সব ক্ষেত্রে।

মমতাদেবীর দুর্ভাগ্য হলো তিনি এমন একসময়ে ভারতের একটি রাজ্যের রাজনীতিতে এলেন যখন তার থেকে আরও উন্নতমানের কোনও রাজনীতিক বা মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শদাতা হিসাবে কাছে পেলেন না। স্বয়ং মমতাদেবীর যদি এই দুর্ভাগ্য হয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবাসীর ভাগ্যে না জানি আরও কত দুর্ভাগ্য আছে।

'মজিল কণকলংকা, মজিলা আপনি।' সীতাদেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে সসম্মানে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ সকলেই রাবণকে করেছিলেন, পাণ্ডবদের রাজ্যভাগ দেওয়ার পরামর্শ অনেকেই দুর্যোধনকে দিয়েছিলেন। দুই মেগালোম্যানিয়াক কারুর কোনও পরামর্শই নেননি।

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে জিজ্ঞাসা করলেন— অখণ্ড রাজত্ব জিনি সুখ তোর কই রে দুর্মতি?

দুর্যোধনের উত্তর—

সুখ চাহি নাই মহারাজ— /জয়! জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।/ ক্ষুদ্র সুখে ভরেনাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা/ কুরুপতি। দীপ্তজ্বালা, অগ্নিজ্বালা সুধা/জয়রস, ঈর্ষা-সিন্ধু-মন্থন-জাত/সদ্য করিয়াছি পান— সুখী নহি তাত/জয়ী আমি আজ।

মমতাদেবী জয়ী। তবে তিনি কতটা সুখে আছেন জানি না। তবে তাঁর কাজ কারবারে রাজ্যবাসী আদৌ সুখে নাই। তিনি নিজেই নিজেকে ক্রুশবিদ্ধ করে চলেছেন।

'অতি' ব্যাপারটায় আমাদের শাস্ত্রকাররা সতর্ক করেছেন। বলেছেন— অতি দর্প করে লঙ্কেশ, অতি মান করে কৌরব, অতি দান করে বলিরাজা বিনষ্ট হয়েছিলেন।

'অতি' ওয়ালারা সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। 'নিন্দারে, করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি।' 'দুর্যোধন রাজা, দুর্যোধন নাহি সহে রাজ নিন্দা আলোচনা, দুর্যোধন বহে নিজ হস্তে নিজ নাম।'

# দোহার জলবায়ু সম্মেলন থেকে কারো বিশেষ কোনও প্রত্যাশা নেই

**নিজস্ব প্রতিনিধি**॥ ডারবান সম্মেলনের পর এবছর কাতার-এর দোহা শহরে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন থেকে কারো বিশেষ কোনও প্রত্যাশা নেই। কোনও শর্তে কিয়োটো চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো যায়, তাই নিয়েই আলোচনা হবে। সেক্ষেত্রে আবার কত তাড়াতাড়ি কার্বন নির্গমন কমানো যায়, সেটাই হলো প্রশ্ন।

রাশিয়ায় ২০১০ সালের গ্রীষ্মে যেরকম ভয়ানক গরম পড়েছিল, সেটাই হয়ত স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে, সমুদ্রে জলের উচ্চতা বাড়বে, গ্রীষ্মমণ্ডলের উন্নয়নশীল দেশগুলিকে লড়াই করতে হবে তীব্র খরার সঙ্গে। এসবই ঘটবে যদি না তথাকথিত গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির নির্গমন কমানো সম্ভব হয়। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রকাশিত একটি রিপোর্টে এই ছবিই এঁকেছেন জার্মানীর পটসডাম জলবায়ু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা। বিশ্বের তাপমাত্রা তিন ডিগ্রী সেলসিয়াস অবধি বাড়ার কথা বলেছেন তাঁরা।

দু' বছর আগে মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি দুই ডিগ্রী সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখা হবে, কেননা তারপরই পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে, অন্তত রাষ্ট্রসংঘে সেই ধরনেরই একটা সমঝোতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। তবুও দোহা সম্মেলনে কার্বন নির্গমন হ্রাস সম্পর্কে কোনও গালভরা প্রতিশ্রুতি পাবার সম্ভাবনা কম।

এর একটা কারণ হলো, বহু দেশ ইতিমধ্যেই তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছে এবং সে অনুযায়ী তাদের জাতীয় আইনও রদবদল করেছে। কাজেই তাদের পক্ষে এখন বলা শক্ত, 'আমরা আরও খানিকটা যোগ করবো।' কেননা তারা জানেই না, তারা এ পর্যন্ত যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে, তা-ই অর্জিত হবে কি না।" মাত্র স্বল্প কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের কাছ থেকে কার্বন নির্গমন হ্রাস সংক্রান্ত নতুন প্রতিশ্রুতি পাবার আশা আছে।

এখনও প্রায় ১০০টি দেশ আছে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ, যারা বিগত কয়েক বছরে জলবায়ুর সুরক্ষা সংক্রান্ত কোনওরকম ঘোষণাই দেয়নি।

এদের মধ্যে ফিলিপাইন্স, থাইল্যান্ড, সৌদি আরব এমনকি এবারকার সম্মেলনের আয়োজনকারী দেশ কাতারও রয়েছে। এবং কিছু কিছু আশাজনক আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, এসব দেশের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত কোনও ঘোষণা পাওয়া যেতে পারে।

দোহা সম্মেলনের সাফল্য-অসাফল্যের মূল মাপকাঠি হবে, কিয়োটো চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো সম্ভব হলো কি না। ২০০৫ সালের এই চুক্তি অনুযায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলি তাদের কার্বন নির্গমন ১৯৯০ সালের তুলনায় পাঁচ শতাংশ কমাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

২০০৮ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে তাদের সেটা করার কথা ছিল। এই তথাকথিত প্রথম প্রতিশ্রুতি পর্বের মেয়াদ শেষ হচ্ছে এ বছর। কিন্তু একটি দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি পর্ব সম্পর্কে দোহায় একমত হবার সম্ভাবনা বিশেষ উজ্জ্বল নয় বলেই মনে করেন পটসডাম জলবায়ু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মুখ্য অর্থনীতিবিদ্ অটমার এডেনহোফার।

তিনি বলেন, "দোহায় কিয়োটো চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আমি মনে করি না। সম্মেলনের প্রাক্কালে আলাপ- আলোচনার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার ধারণা, আমরা একটা কূটনৈতিক কানাগলিতে ঢুকে পড়েছি এবং দোহায় এই সুবিশাল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না।"

অথচ গত বছর ডারবান সম্মেলনেই কিন্তু দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি পর্বের মেয়াদ বাড়ানোর কথা স্থির হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাই দোহাতে সেই রকমের নিশ্চয়তা চায়।

কিন্তু এখন গোল বেঁধেছে কিয়োটো চুক্তির মেয়াদ ২০১৮, না ২০২০ সাল অবধি বাড়ানো হবে তাই নিয়ে। জার্মানওয়াচের সোয়েন হার্মেলিং বলেন, "ইউরোপীয় ইউনিয়ন চায় যে, কিয়োটো চুক্তির দ্বিতীয় মেয়াদ ২০২০ সাল অবধি চলুক।"

অন্যদিকে বিশেষ করে ছোট দ্বীপ রাজ্যগুলি বলছে, তারা চায় পাঁচ বছরের মেয়াদ। নয়তো জলবায়ু সুরক্ষার এই অতি নিম্ন পর্যায়ের লক্ষ্যমাত্রা আরও আট বছর ধরে বজায় থাকবে বলে তাঁরা আশঙ্কা করছেন।

অথচ দোহাতে যদি কিয়োটো চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো সম্ভব না হয়, তবে সেটা জলবায়ু সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় মাপের বিপর্যয় হবে, কেননা কিয়োটো চুক্তিই হলো একমাত্র চুক্তি, যেখানে কার্বন নির্গমন হ্রাসের আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক লক্ষ্যগুলি নির্দিষ্ট করা আছে।

## ‘দোহা’ বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন

# ইউরো-মার্কিন দাদাগিরির আর এক দৃষ্টান্ত

**এন. সি. দে**

নয় নয় করে ১৮টি সম্মেলন হয়ে গেল জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের ফ্রেমওয়ার্ক কমিশনের অধীন দেশগুলির; যার পোশাকি নাম কনফারেন্স অফ পার্টিস (সি ও পি) টু জি ইউ এন ফ্রেম ওয়ার্ক কমিশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ। এবারের সম্মেলনটির সংক্ষিপ্ত নাম সিওপি-১৮। এর আগে সিওপি-১৭ বসেছিল ডারবানে, সিওপি-১৬ বসেছিল কানকুনে এবং সিওপি-১৫ বসেছিল কোপেনহেগেনে ২০০৯-এ। সেই সম্মেলন নিয়ে আমি এই পত্রিকাতেই দীর্ঘ লেখা লিখেছিলাম। সেই লেখাটিতেও যা লিখেছিলাম আজও তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইউরো মার্কিন প্রভাবাধীন দেশগুলোর দাদাগিরি, বানিয়াবৃত্তি সেবারও ছিল, এবারও সেই বানিয়াবৃত্তির জন্যই দোহায় অনুষ্ঠিত ১৮তম সম্মেলনটিতেও এক ফোঁটাও অগ্রগতি হলো না। বিষয় সেই কিয়োটো চুক্তি।

*সভাপতি ও সম্পাদকের উপস্থিতিতে ‘দোহা সম্মেলন’-এর মঞ্চ।*

**কি এই কিয়োটো চুক্তি?**

এই চুক্তিটির পোশাকি নাম Kyoto Protocol। এই প্রোটোকল গৃহীত হয়েছিল ১৯৯৭ সালে ১১ ডিসেম্বর। জাপানের কিয়োটো শহরে এটি গৃহীত হয়েছিল বলে এই শহরের নামে এই প্রোটোকলের নামও হয় কিয়োটো প্রোটোকল। এটি একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ চুক্তি যার লক্ষ্য পরিবেশে থাকা গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রাকে একটি স্তরে স্থিতিশীল রাখা যা পরিবেশকে বিপজ্জনক অ্যানথ্রোপজিনিক কবল থেকে রক্ষা করবে। এই প্রোটোকলে ৩৭টি শিল্পোন্নত দেশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা পরিবেশে চার রকমের গ্রিন হাউস গ্যাস (কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ও সালফার হেক্সাফ্লোরাইড) এবং হাইড্রোক্লোরোকার্বন ও পারফ্লোরোকার্বনের মতো দুই রকম গ্যাসকে ১৯৯০ সালের মাত্রা থেকে ৫.২ শতাংশ কমাবে। তবে এই গ্যাস নির্গমনের মাত্রার মধ্যে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল ও জাহাজ চলাচলজনিত দূষণকে ধরা হয়নি। যে সমস্ত গ্যাস নির্গমনের কথা বলা হয়েছে তা কেবল এই সমস্ত দেশগুলোই করে থাকে।

**দোহা সম্মেলনের পরিণতি :**

দোহা সম্মেলনের পরিণতি আগের ১৭টি সম্মেলনের মতোই করুণ। তবে দোহা সম্মেলনের পরিণতিটিই বোধহয় মর্মান্তিক কারণ এবারের সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হলো কিয়োটো প্রোটোকল। ১৯৯৭ থেকে ২০১২ মার্কিন নেতৃত্বে ইউরোপের দেশগুলি সমেত শিল্পোন্নত কোনও দেশই তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি কোনওটাই পালন করেনি। তারা সব সময়ই চেষ্টা করেছে নতুন করে চুক্তি করতে যাতে দায় চাপানো যায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর। পরিবেশ দূষণ কমাতে তাদের লক্ষ্য নয়া পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিক্রি করা। বিশ্বের আকাশ-বাতাসকে যারা বছরের পর বিষাক্ত করেছে তারা এর দায় নেবে না। বরং তারা ঋণ দেবে নয়া প্রযুক্তি কেনার যা দেশগুলি তাদের শিল্প মালিকদের কাছ থেকে লেভির মাধ্যমে আদায় করে নেবে।

১৯৪টি দেশ কাতারের দোহা শহরে মিলিত হয়েছিল একটি কার্যকরী সিদ্ধান্তে আসার জন্য। কিন্তু সম্মেলনের পূর্ব-নির্ধারিত দিনগুলিতো বটেই, এমনকি বর্ধিত একটি দিনের মধ্যেও লাগাতার আলোচনা চালিয়েও ইউরো-মার্কিন বাহিনীকে কিয়োটো প্রতিশ্রুতি মানানো যায়নি। অবশেষে মুখ রক্ষার খাতিরে একটি সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছে যে কিয়োটো প্রোটোকল আরও ৮ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ করা হবে। নয়া চুক্তি অনুযায়ি বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার কাজও ২০১৫ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে এবং আশা করা হচ্ছে ২০২০ থেকে কার্যকরী হতে পারে। ইতিমধ্যে ঠিক করা হবে কেমন করে গরীব দেশগুলো টাকা যোগাড় করবে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাদের দেশে পরিবেশ রক্ষা করতে। অর্থাৎ ধনী দেশগুলো তাদের দায় গরীব দেশগুলোর উপর চাপাতে সক্ষম হলো এই নয়া চুক্তিতে। কোথায় গেল ইন্দোনেশিয়ার বালি শহরে গৃহীত ‘Bali Road Map’?

কোথায়ই বা গেল ‘Copenhagen Accord’? শুধুই জয় হলো ইউরো-মার্কিন দাদাগিরি ও বানিয়া বৃত্তির।

**কি এই বানিয়াবৃত্তি?**

এই বানিয়াবৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল কোপেনহেগেন সম্মেলনে গৃহীত ‘Copenhagen Accord’-এর পর থেকে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এই ‘Accord’-এর সুযোগ করে দিয়েছিল কংগ্রেস-শাসিত ভারত সরকারই। এরই সুযোগ নিয়ে দেশের খবরের কাগজ, টিভি চ্যানেল ও কেনা গোলাম বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে প্রচার চালাতে লাগল বায়ুদূষণের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। টিভি চ্যানেলগুলিতে দেখাতে লাগল মেরুপ্রদেশে কিভাবে বরফ গলছে। অতি বৃষ্টি হলেই বলতে লাগল এটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্যই হচ্ছে। আবার অনাবৃষ্টি হলেও একই যুক্তি দিচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘটিয়ে দিচ্ছে সামুদ্রিক কিছু প্রাণীর মৃত্যু, এক ঝাঁক কাকের মৃত্যু, মুরগীর মড়ক কিংবা শূকরের মড়ক। পালা করে ঘটিয়ে দিচ্ছে চিকেনগুনিয়া, বার্ড ফ্লু, ডেঙ্গু, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া ইত্যাদি মারণ ব্যাধি। আমাদের দুর্ভাগ্য, এই সময় ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতায় রয়েছে একটি বিশ্ব পুঁজিবাদের দালাল সরকার। এই দলটি তার জন্মলগ্ন থেকেই কখনও ইংরেজদের দালালি করেছে, কখনও দালালি করেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের, এখন করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দালালি। ২০০৮’এর আর্থিক মন্দার হাত থেকে মুক্তি পেতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা ছুটে এসেছিল এদেশে তার দালালের সাহায্য নিতে। কোটি কোটি টাকার প্রযুক্তি রপ্তানীর বরাত যেমন নিয়ে গেছে, তেমনি আমাদের শেয়ার বাজারে অবাধে শেয়ার কেনার সুযোগেরও প্রতিশ্রুতি নিয়ে গেছে এফ আই আই অর্থাৎ বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির লগ্নির সুযোগে আজ এদেশের বেশিরভাগ দেশী কোম্পানীগুলির শেয়ারই বিদেশীদের হাতে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বায়ু দূষণের নাম করে ১৫ বছরের পুরানো গাড়ির চলাচল বন্ধ করে নতুন গাড়ি বিক্রি করার সুযোগ যেমন করে দিয়েছে বৃহৎ গাড়ি কোম্পানীগুলিকে ঠিক তেমনিভাবে গাড়ি কেনার ঋণ হিসাবে সুদে খাটিয়েছে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা। NREGA, JNNURM, NHRM প্রভৃতি খাতে টাকা বিলিয়ে বিদেশী দ্রব্যের বাজার অটুট রেখেছে। গত বছরে কমার্শিয়াল গাড়ি বিক্রি বেড়ে গিয়েছিল কয়েক গুণ। এবারে আবার জেহাদ ঘোষণা করেছে আমাদের লাঙ্গল চষার বিরুদ্ধে। এতে নাকি মাটিতে শিকড়-বাকড় থেকে যায় তাতে মাটি দূষণ হচ্ছে। এইভাবে মাটি চষা চলবে না। ইউরো-মার্কিন দাদাদের কাছ থেকে কিনতে হবে নয়া herbicides প্রযুক্তি। আর কতকাল ভারতবর্ষের নির্বোধ মানুষ এইভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের নগ্ন শিকারে পরিণত হতে থাকবে ঈশ্বরই তা জানেন!

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO)-তেও ইউরো-মার্কিনীদের দাদাগিরিতে আজও আটকে আছে WTO গঠনের সময় তাদের দেওয়া নানান গালভরা প্রতিশ্রুতি উরুগুয়ে চুক্তি। একটিও তারা মানেনি। ভারতের মতো বৃহৎ দেশের নেতৃত্বের দিকেই তাকিয়ে আছে বিশ্বের ছোট ছোট দেশগুলো। কংগ্রেস-চালিত সরকার এ নেতৃত্ব দেবে না। স্বদেশী অর্থনীতিতে বিশ্বাসী একটি দলের দিকেই তাকিয়ে আছে সারা বিশ্ব।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা সুন্দরবন ভ্রমণ করুন ....

**বনভূমি ট্রাভেলস্**

প্রো ঃ - মৃগাঙ্ক রায়

৯৭৩৪২০৬০৪০ / ৯৮০০৬৮৪২০১

ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট,
ক্যানিং টাউন, দক্ষিন ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩২৯
Email : banbhoomitravels@gmail.com

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

# বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে সামুদ্রিক আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদের ভূমিকা

**শুভস্মিত সিংহ**

বিশ্ব উষ্ণায়ণ বা Global Warming শব্দ দুটোর সঙ্গে আমরা কম বেশি সকলেই পরিচিত। টেলিভিশনের রিমোট ঘোরালেই আজ বোঝা যায় যে এই ব্যাপারটা সারা পৃথিবীর মানুষকে কতটা প্রভাবিত করেছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে আজ ঋতুচক্রে (Seasonal cycle) একটা বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে তা আমাদের কারোর অজানা নয়। বিগত ষাট বছরে পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ২৮০ পিপিএম (ppm--pats per million) থেকে প্রায় ৩৬৫ পিপিএম, (US, Department of Energy, 1999)। ১৯৮০-এর দশকে এর পরিমাণ বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৩.৩ গিগাটন কার্বন প্রতি বছরে (Gtc/yr.)। দেখা গেছে, এর মধ্যে প্রায় ২.০ গিগাটন কার্বন প্রতি বছরে সমুদ্রে শোষিত হয় এবং ১.৩ গিগাটন কার্বন প্রতি বছরে ভূমি (land) শোষণ করে, (US, carbon cycle plan, 1999)। সুতরাং এই পরিসংখ্যানটি থেকে বোঝা যায় বাতাসে উদ্ভূত কার্বন ডাই অক্সাইডের অধিকাংশই সমুদ্রে শোষিত (Absorbed) হয়, তাই ভবিষ্যতে সমুদ্র (Ocean) পরিবেশে কার্বনের পরিমাণ কমাতে পারে, এবার আমরা সামুদ্রিক পরিবেশ (Oceanic Environment) সম্পর্কে একটু অবগত হই।

সামুদ্রিক পরিবেশ দুটো প্রধান ভাগে বিভক্ত : (১) জলজ পরিবেশ (Pclagic environment) (২) সামুদ্রিক তলদেশ (Benthic environment)। জলজ পরিবেশে দু'ধরনের জীব লক্ষ্য করা যায়— (ক) প্ল্যাঙ্কটন : এই সামুদ্রিক জীবন জলের গতির (Ocean current) বিপরীতে যেতে পারে না। (খ) নেকটন, এরা মুক্ত সাঁতারু [free swimmers], এরা জলের গতির বিপরীতে যেতে পারে।

'প্ল্যাঙ্কটন' (Plankton) শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'planktos' থেকে, যার অর্থ ইংরাজীতে

passively drifting or wandering। প্ল্যাঙ্কটন আবার দুটি ভাগে বিভক্ত— (১) ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন (২) জুপ্ল্যাঙ্কটন (Zooplankton), ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, সামুদ্রিক আণুবীক্ষণিক [microscopic] উদ্ভিদ যা উপকূলবর্তী অঞ্চলে [Estuarine region] থাকে। এরা জলের উপরে ২০০ মিটারের মধ্যে থাকে, কারণ বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইডকে ব্যবহার করে এরা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া (Photosynthesis) সম্পাদন করে। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে এরা পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইড বাজেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, দেখা গেছে, পৃথিবীতে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন পপুলেশন (population) এবং প্রজাতি (species) যত বেশী হয়, তত বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড এরা বাতাস থেকে টানে (Pulled from atmosphere)। এর ফলে পরিবেশে গ্রীন হাউস গ্যাস এর পরিমাণ কমে যায়, পরিবেশের তাপমাত্রাকেও কমাতে সাহায্য করে। বৈজ্ঞানিকরা দেখেছেন যে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন প্রতিদিন একবার তাদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করতে পারে, অর্থাৎ এরা পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খুব দ্রুত সাড়া দেয় (Respond very rapidly)।

ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন যেহেতু সমুদ্রে পতিত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যকে এদের কোষ গঠন বা Cell structure গঠনে গ্রহণ করে, তাই এদের রাসায়নিক সঙ্কেত হলো $(CH_2O)_{106}\ (NH_3)_{16}\ H_3PO_4$ ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের গঠনগত উপাদান (Elemental Composition) হলো C : N : P=106 : 16 : 1. [C=Carbon, N=Nitrogen, P=Phosphorus]। এই অনুপাত বা Ratio-কে বলা হয় 'রেডফিল্ড রেশিও' [Redfield, 1934, 1958] এই অনুপাত থেকে বোঝা যায় যে প্রতি ১৬ ইউনিট নাইট্রোজেন এবং এক ইউনিট ফসফরাসের জন্য প্রায় ১০০ ইউনিট কার্বন গভীর সমুদ্রে (Deep sea) যায়। যেহেতু জৈবিক পাম্প (Biological pump) কার্বনকে বাতাস থেকে গভীর সমুদ্রে পাঠিয়ে দেয় ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের

মাধ্যমে এবং তা গভীর সমুদ্রে বছরের পর বছর ধরে ঘনীভূত হয় [Concentrated]।

ভারতীয় সুন্দরবন (৯৬৩০ বর্গকিমি) সামুদ্রিক উপকূলবর্তী অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। এই অঞ্চলে সাতটি নদী প্রবাহিত হয়েছে। (১) হুগলী, (২) মুড়িগঙ্গা, (৩) সপ্তমুখী, (৪) ঠাকুরান, (৫) মাতলা, (৬) গোসাবা, (৭) হাড়িভাঙা। এদের মধ্যে হুগলী ও মুড়িগঙ্গা সরাসরি গঙ্গোত্রী হিমবাহ (Gangotri Glacier)-এর সহিত যুক্ত হবার জন্য, ভারতীয় সুন্দরবনের পশ্চিমাঞ্চল [Western Sector] অপেক্ষাকৃত কম লবণাক্ত [Less saline], অপরদিকে বাকি পাঁচটি নদীর সহিত হিমবাহের সংযুক্তি নাই। সেজন্য যেখানে পরিষ্কার মিষ্টি জল [fresh water discharge] কম, সেখানে সামুদ্রিক লবণাক্ত জল বেশি। গবেষণায় দেখা গেছে, যে ভারতীয় সুন্দরবনের পূর্বাঞ্চল [Eastern Sector] বেশি লবণাক্ত হওয়ায় সেখানে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের কোষ আয়তন [Cell volume] অনেক কম। তুলনায় পশ্চিমাঞ্চলের ফাইটোপ্লাঙ্কটনের কোষ আয়তন বেশি। পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, মেরু অঞ্চলে বরফ গলিয়ে দিচ্ছে, ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলে মিষ্টি জল-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমুদ্রতল প্রায় প্রতি বছরে ৪ মিলিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। [sea level rise]। বেশি লবণাক্ত অঞ্চলে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের কোষ আয়তন কম হবার দরুণ, কোষে কার্বনের পরিমাণ বেশি। এই কার্বন কিন্তু পরিবেশ থেকে গৃহীত হয়ে তা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কনের কোষে রাসায়নিক পদার্থ (গ্লুকোজ, $C_6H_{12}O_6$) হিসাবে সঞ্চিত আছে। ভারতীয় সুন্দরবনে প্রায় ১০২ ধরনের ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন এর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে কিছু এখানে উল্লেখিত হলো যথা : *Coscinodiscus gigas, Biddulphia sinensis, Rhizosolenia crassipina* ইত্যাদি।

পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কমাতে অনেক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে যা অত্যন্ত দুরুহ ও উচ্চমূল্যের কারণে [Sophisticated and high cost] তা সর্বত্র ব্যবহার সম্ভবপর হচ্ছে না। এখানেই সামুদ্রিক আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনকে ব্যবহার করার কথা ভাবছেন বিজ্ঞানীমহল। বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশ্য ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন পপুলেশন-এর বৃদ্ধি ঘটিয়ে আরও কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাস থেকে শোষণ করিয়ে বাতাসে তার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা, বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা (গ্রীন হাউস গ্যাস) নিয়ন্ত্রণে থাকলে তা বিশ্ব উষ্ণায়নকেও রোধ করতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। গবেষকরা দেখেছেন ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন পপুলেশন বাড়াতে গেলে তার কোষ সংখ্যাও [cell number] বৃদ্ধি প্রয়োজন, জীববিদ্যায় [Biology] কোষ সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে কোষচক্র বা cell cycle-এর মাধ্যমে। PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) একটি প্রোটিন যাহা কোষ চক্রের সংশ্লেষ দশায় [Synthesis phase] প্রকাশিত হয়। এই সংশ্লেষ দশায় কোষে DNA (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং কোষের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। বৈজ্ঞানিকরা আরও দেখেছেন যে আয়রন (Iron, Fe) এমন একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান যাহা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। এই আয়রন ব্যবহার করে এবং কোষচক্রের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যদি ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটানো যায় তাহলে উহা বেশি পরিমাণে পরিবেশের $CO_2$ এর পরিমাণ হ্রাস করতে পারে যা পরিবেশে গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ কমিয়ে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে রোধ করতে সক্ষম হবে।

*(লেখক ডক্টোরাল রিসার্চ ফেলো, ক. বি.)*

নেত্রদান মহাদান

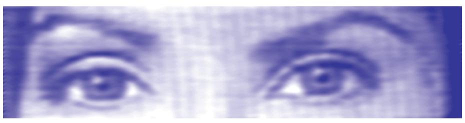

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®
নিখুঁত লেখার খাতা

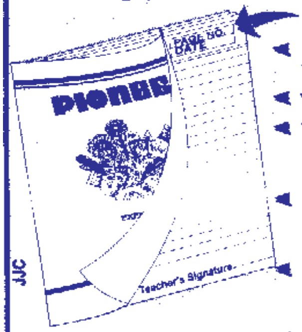


প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. / DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane(1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0556
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

# চিঠিপত্র

## গোরুপাচারের আইনি স্বীকৃতি

খবরে প্রকাশ বি এস এফ-এর এক উচ্চ আধিকারিক মন্তব্য ও পরামর্শ দিয়েছেন, গোরু পাচারকে আইনি স্বীকৃতি দিতে। তাহলেই গোরু পাচার সমস্যা মিটে যাবে। কোনও সুস্থ মানসিকতার ব্যক্তি এ ধরনের কথা বলতে পারেন না। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ গোরু পাচার হওয়াতে দেশ হারাচ্ছে কয়েক কোটি টাকার মূল্যের গো-সম্পদ। অপর দিকে বাংলাদেশ গো-মাংস বিক্রি করে কোটি, কোটি ডলার কামিয়ে নিচ্ছে। গোরু পাচার হয়ে যাওয়ার ফলে দেশ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, নিম্নে তুলে ধরেছি।

গোরুর মূল্য অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার ফলে গরীব কৃষকের পক্ষে হালের বলদ ক্রয় করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। এখনও কৃষিতে গোরুই প্রধান ভরসা। গোবর ও গোমূত্র থেকে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে। কৃষি কাজে যথেষ্ট গোবর সার প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। গাই-গোরুও পাচার হচ্ছে। ফলে দুধের অভাব দেখা দিচ্ছে, যার জন্য বাজার থেকে কৃত্রিম দুধ কিনে শিশু ও বৃদ্ধদের পান করাতে হচ্ছে। যা স্বাস্থ্যকর নয়। গোমূত্র থেকে আজকাল নানাপ্রকার ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি হচ্ছে। গোবর থেকে গ্যাস তৈরি করে জ্বালানির কাজে ব্যবহার করা হয়। যথেষ্ট পরিমাণ গোবর ও গোমূত্র না থাকাতে দেশ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গোরুর সংখ্যা দিন দিন কমে যাওয়াতে সার চর্মশিল্প মার খাচ্ছে। অপরদিকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ থেকে সার আমদানি করতে হচ্ছে। যা কৃষিকাজে ব্যবহার করে জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাসায়নিক সার প্রয়োগে উৎপাদিত খাদ্য খেয়ে নানারকম কঠিন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে।

গোরু পাচার বন্ধ করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। সীমান্তে বেশি সংখ্যক বি এস এফ ক্যাম্প তৈরি করা। ভারত-বাংলাদেশ সীমানায় কাঁটাতারের বেড়ার কাজ দ্রুত শেষ করা। পাচারকারীদের দেখামাত্রই গুলির নির্দেশ দেওয়া। উঁচু টাওয়ার তৈরি করে, জোরালো আলোর মাধ্যমে নজরদারি করা। সীমান্তে টহলরত কর্মীদের সঙ্গে উন্নতমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা করা। সরকার যদি কঠোর ভাবে এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তবেই গোরু পাচারসহ সব ধরনের পাচার বন্ধ করা মোটেই কঠিন হবে না। আসলে প্রয়োজন সদিচ্ছার।

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত দিয়ে যে গোরুগুলো পাচার হয় সেগুলো বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে ট্রাকে ও ট্রেনে করে এসে জলপাইগুড়ির সোনাপুরে রাখা হয়। ওখান থেকে বৈধ কাগজপত্র তৈরি করে, কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ি ও ডোডেয়ার হাটে বিক্রয় করা হয়। দেশি গোরুও পাচার হচ্ছে। কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবন্ধা ও দিনহাটা সীমান্ত দিয়ে গোরু পাচার হয়ে যাচ্ছে। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কোনও প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে গোরু নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করা উচিত। আন্তঃরাজ্য চেক পোস্টগুলিতে কড়া নজরদারি করা উচিত যাতে গোরু পাচার হতে না পারে। বি এস এফ প্রধানের যুক্তিকে তারিফ করতেই হয়। এ যেন চোর ধরতে না পেরে গৃহকর্তাকে রাত জেগে থাকার পরামর্শ। কোনদিন হয়তো শুনব চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ধর্ষণকেও আইনি স্বীকৃতি দিতে হবে। আমরা কোন গণতান্ত্রিক দেশে বাস করছি! ভাববার সময় হয়েছে। রাষ্ট্র চালকদের এ বিষয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন।

**—অনিলচন্দ্র দেবশর্মা, দেবীবাড়ী, নতুনপাড়া, কোচবিহার।**

## আমাদের সকলের প্রিয় নির্মলদা

সেদিন প্রভাত শাখায় আমরা চারজন স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলাম। শাখার শেষে কৌতুক করে নির্মলদাকে বললাম আমরা আজ হারাধনের চারটি ছেলে। নির্মলদা অনায়াসে উত্তরে বললেন আমার নাম কেটে দিন এবার। আমি বললাম, এমন কথা বলতে নেই নির্মলদা, আমি নাম কাটতে পারি কি? তিনি এবার একগাল হেসে বললেন, এটাই হবে এবার অজিতদা। নির্মলদা অর্থাৎ নির্মল চন্দ্র দাস, বাঁকুড়া বিভাগের বৌদ্ধিক প্রমুখ। শিবাজী প্রভাত শাখার কে জানত সত্যি কাটা যাবে তাঁর নাম। শুধু বাঁকুড়ার শিবাজী প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক হিসাবে নয়, এই পৃথিবী থেকেও। সেদিন তা নিছক কথার কথা মনে হলেও আজ সেকথা বড় ব্যথা হয়ে বুকে বাজে। প্রতিদিন শাখা শুরুর আগেই তিনি শাখা বেশ পরে হাজির থাকতেন। তার প্রতিটি কাজে ছিল দৃঢ় অনুশাসন ও একাগ্রতার নিষ্ঠা। গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করতেন তিনি। তাঁর প্রতিটি কাজ ছিল শান্ত ও স্থির বুদ্ধিতে। সুন্দর এবং সঠিক পদ্ধতিতে প্রতিটি কাজ হোক এটাই ছিল তাঁর কাজ করার বৈশিষ্ট্য। নিরুদ্বিগ্ন ছিলেন কাজে। প্রচারকের দায়িত্ব পালনে সেই কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় ছিল অতুলনীয়। তাঁর অতুলনীয় দায়িত্ববোধ আমাদের সকলের অনুকরণীয় ছিল।

নির্মলদার পরিবার স্বাধীনতার পূর্বেই অবিভক্ত বাংলায় নিজেদের বিষয় সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করে বাঁকুড়ায় এসে বসবাস শুরু করেন। নির্মলদার জন্ম এখানেই। স্বাভাবিকভাবে সংসারে স্বচ্ছলতা পরিবারে ছিল না তেমন। এর মধ্যেই তিনি শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে বড় হয়েছিলেন। ঝাড়খণ্ডের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে তিনি ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট লাভ করেন। এর পর সংসারের আর্থিক কারণে উপার্জনের উপায় করার প্রয়োজন ছিল খুব বেশি। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর চলার পথ আগে থেকেই নির্দিষ্ট করেছিলেন। ইতিপূর্বে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক হয়েছিল। অতএব সেই কাজের প্রয়োজনে সেখানে যোগদান করে প্রচারক হোন। অত্যন্ত কুশল ও বিচক্ষণ কর্মকর্তা রূপে প্রায় ছয় বৎসরকাল প্রচারকের দায়িত্বে থেকে প্রয়োজনে বাড়ি ফিরে আসেন। নির্মলদার অনেক দুর্লভ গুণের মধ্যে ছিল সংযত মন। তাঁর প্রতিটি কাজেই এর প্রকাশ ঘটতে দেখেছি। তিনি বিতর্ক এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন। বিতর্ক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে বিষয়ে তিনি সতর্ক থাকতেন। কোনও বিশেষ অবস্থায় তার বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত না হয়ে কখনো তর্কে জড়াতে চাইতেন না।

**—অজিত কুমার বারিক, উত্তরায়ণ পল্লী-৪, বাঁকুড়া।**

# রাজনৈতিক সংস্কৃতি

**সুকুমার দাস**

আজকাল টিভিতে আলোচনায়, সংবাদপত্রে এবং রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতায় একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়— রাজনৈতিক সংস্কৃতি। বক্তব্য এই সংস্কৃতিটি একদম নষ্ট হয়ে গেছে। যাঁরা এই কথাটা বলেন, তাঁদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে কতখানি স্পষ্ট ধারণা আছে সেটাই সন্দেহের বিষয়।

সংস্কৃতি অকস্মাৎ গড়ে ওঠা কোনও জিনিস নয়। সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। সংস্কারের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি গড়ে উঠে। উন্নতমানের একটি সংস্কৃতি গড়ে ওঠে বহু প্রতীক্ষার পর। একটি দেশের সভ্যতাকে মন্থন করে গড়ে ওঠে সেই দেশের সংস্কৃতি। মানুষের আচার-আচরণ, সভ্যতা-ভব্যতা, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্মীয় ভাবাবেগ, চাল-চলন, জীবনদর্শন এই সবকিছুকে কর্ষণ করে, সেই কর্ষিতের মধ্য দিয়েই উঠে আসে গরল-অমৃত। গরলকে বাদ দিয়ে অমৃতকেই মানুষ গ্রহণ করে। এই মন্থন বা কর্ষণের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। একটা সভ্যতার সাম এন্ড সাবসটেন্স হচ্ছে সংস্কৃতি। দুধ মন্থন করে যেমন ননী পাওয়া যায়, সভ্যতাকে মন্থন করেও সেইরূপ সেই সভ্যতার সংস্কৃতি পাওয়া যায়। দেশপ্রীতি, সহনশীলতা, মর্যাদা এগুলি সংস্কৃতিরই অঙ্গ। ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এই বোধশক্তিগুলিকে মানদণ্ড করে। রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করলেই ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা জন্মে। চিন্তাশক্তির পরিণত রূপ ভাবনা বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরের সেখানে স্পষ্টীকরণ হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পাঠানো কৈকেয়ী চরিত্রের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। সেই আদেশ নয়। পিতৃসত্য পালনের মধ্য দিয়ে পুনরায় অযোধ্যায় ফিরে এসে রাজা হওয়া, এই ধৈর্যশক্তি ও সহনশীলতা একমাত্র ভারতবর্ষের মাটিতেই সম্ভব। যে সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি, মহাপুরুষ, ভারতীয় সংস্কৃতির স্রষ্টা, ধারক এবং বাহক, রামচন্দ্র অবশ্যই তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। হাজার হাজার বছর ধরে, একটি পরম্পরার মধ্য দিয়ে এদেশে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বর্তমানে সংস্কৃতি বলে যা চালানোর চেষ্টা হচ্ছে তা অপসংস্কৃতি মাত্র। এই অপসংস্কৃতিকে দূর করে প্রাচীন এবং প্রকৃত অর্থে যা সংস্কৃতি বোঝায়, সেটাই অনুসরণ করতে হবে। তবেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি চাঙ্গা হবে। মূল সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে রাজনৈতিক-সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না। রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কৃষ্ণকে হত্যার জন্য বিদেশ থেকে লোক আনয়ন, এসব আচরণের জন্য পাপাচারীদের শাস্তি পেতে হয়েছে। তাদের বিনাশ সাধন হয়েছে। এসমস্ত কার্যকলাপ যে সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে না তা সে যুগেই প্রমাণিত হয়েছে। রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণবধ, দ্রৌপদীকে বস্ত্র সরবরাহ, কালযবনের নিধন যারা ঘটিয়েছেন, তারাই সাংস্কৃতিক পুরুষ। তারাই এদেশে সংস্কৃতি তৈরি করে গেছেন।

কিন্তু এ যুগে ওই সমস্ত দুষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তি হয় না। শাস্তি না হলে শিক্ষা হবে না। তাই রাজনীতিতে প্রণববাবুর মতো ব্যক্তির কাপড় খুলে দেওয়া হয়, শোভনদেবের মতো ব্যক্তিকে চড় খেতে হয়। এই আচরণ অপসংস্কৃতির অঙ্গ। রাজনৈতিক শিষ্টাচার এরা জানে না। এরাই রাজনীতিতে অপসংস্কৃতি তৈরি করছে। 'টাকা দিয়ে কোর্টের রায় কেনা যায়', 'কোর্টে পরাজিত হলে কিভাবে জমি দখল করতে হয় তা গ্রামবাসী দেখিয়ে দিবে', 'লালা তুই বাংলা থেকে পালা', এই আচরণগুলি কী? এ সবই হচ্ছে রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি। তাহলে রাজনীতিতে সংস্কৃতি থাকবে কিভাবে? এইসব আচরণ কারা সংশোধন করবে? জনতা-ভোটাররাই পারে সংশোধন করতে। দাড়িওয়ালা রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। এযুগে দাড়িওয়ালা শুভাপ্রসন্ন নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছেন। দলের নেত্রীর বিচার কই? তিনি রাজনীতিতে কি সংস্কৃতি দেখাবেন? নেত্রী ডাকছেন না, নির্বাচিত এম পি ন্যাড়া মাথা নিয়ে নেত্রীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত বলেই যাচ্ছেন। রাজনীতিতে সংস্কৃতি তৈরি হবে কিরূপে?

দেশ আক্রান্ত হলে কোনও একটি রাজনৈতিক দল বলেছিল মুক্তিফৌজ এসেছে। এদেশের মুক্তির জন্য। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মরতে হয় কেন? ভারতের রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য উপঢৌকন দিতে হয়, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য দেশভাগ করতে হয়। রাজনীতিতে এগুলি অশুভ সংকেত। দেশের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

এইসব সিদ্ধান্তগুলিই রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে নষ্ট করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও টাকার বিনিময়ে এম পি খরিদ করে প্রধানমন্ত্রী হওয়া। সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতি এদেশে থাকবে কী করে? শ্যামাপ্রসাদ, দীনদয়ালের মতো রাজনীতিকদের চক্রান্ত করে, গুণ্ডা লাগিয়ে হত্যা করা হলো। যারা করলো বা করালো তারাই তো দেশ শাসন করছে।

পশ্চিমবাংলার জনৈক মন্ত্রী সম্বন্ধে বলা হচ্ছে সন্ধ্যার পর উনি ঠিক থাকেন না, তখন উনি এরকম আচরণই করেন। মন্ত্রিসভায় এঁদের সংখ্যাটাই বেশি। মন্ত্রীদের ভোগের জন্য মফস্বল শহর থেকে মহিলা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এটাই শোনা যাচ্ছে বেশি। এরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি করবে?

প্রফুল্ল ঘোষ, বিধান রায়, প্রফুল্ল সেন, এঁরাও তো মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এঁরা যে রাজনৈতিক আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি করে গেছেন, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, জ্যোতি বসুদের আমলে সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি উড়িয়ে দিয়ে নূতন যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন, সেই পরম্পরাই সমানে চলেছে। ত্যাগ, ত্যাগ কোথায়? মা-মাটি-মানুষের কথা মুখে বললে তো হবে না। হাওয়াই চপ্পল পরলেই ত্যাগ প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

সর্বোপরি ভারতের পার্লামেন্টের কথা বলে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ছবিটি তুলে ধরছি। এই যে দিনের পর দিন পার্লামেন্ট স্তব্ধ করে দেওয়া হয় কেন? সরকারপক্ষ এমন আচরণ করবেন কেন যাতে বিরোধীরা পার্লামেন্ট বন্ধ করে দেবে। যাঁরা স্তব্ধ করেন তাঁদেরও এটা বোঝা উচিত। সরকারপক্ষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অন্য কৌশল আবিষ্কার করা দরকার। এগুলি বন্ধ না হলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক অপসংস্কৃতিতেই পরিণত হবে।

# ভারতে নারীত্ব সাধনার পরম্পরা

**রবীন সেনগুপ্ত**

কথা প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে যে সীতাদেবীই হলেন ভারতীয় নারীদের আদর্শ। কিন্তু ভারতীয় নারীদের নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় যে শুধু সীতাদেবীই নন, মা-কালী ও দুর্গাদেবীর মতো রণপটু ভারতীয় নারীরাও দীর্ঘদিন থেকেই এদেশে আদর্শ স্বরূপা হিসাবে পূজা পেয়ে আসছেন। মা-কালীর সঙ্গীনি ডাকনী-যোগিনীরাও বহুদিন থেকে এদেশে সম্মানীয়া। ঘরোয়া পতিব্রতা সর্বংসহা নারীর ক্ষেত্রে সীতাদেবী অবশ্যই আদর্শ। কিন্তু আদর্শের নানা মাপকাঠি এদেশে পুরুষদের ক্ষেত্রে যেমন রয়েছে, নারীদের ক্ষেত্রেও তেমনই রয়েছে। যেমন বিদূষী নারী হিসাবে মা সরস্বতী হলেন ভারতের আদর্শ। আবার ধনবতী নারী হিসাবে সরস্বতী, দুর্গা বা সীতাদেবী নন, মা-লক্ষ্মীই হলেন এদেশের আদর্শ। প্রেমিকা নারী হিসাবে আবার এঁরা কেউ নন, রাধিকা দেবীই সেখানে আদর্শস্থানীয়া রূপে গণ্য হন। ক্রোধী তেজস্বী পুরষদের মধ্যে যেমন দুর্বাসা মুনি ও ভৃগু মুনিকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে মান্য করা হয় তেমনি নারীদের ক্ষেত্রে মা মনসাকে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠা বলে মান্যতা দেওয়া আছে শাস্ত্রে। সাধিকা হিসাবে তুলসী দেবী, অরুন্ধতী দেবী, অনুসূয়া দেবীকে সে যুগের প্রধান বলে মান্য করা হয়। তেমনি মা সারদা, শ্রীমা, ভগিনী নিবেদিতা, মা আনন্দময়ীকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ যোগসাধিকার আদর্শ মাপকাঠী হিসাবে অনেকেই বিবেচনা করেন।

সাম্রাজ্য পরিচালনা ও ভক্তির একত্র নিদর্শন স্বরূপা হলেন হোলকার রাজ্যের রাণী অহল্যাবাঈ। শুদ্ধা ভক্তির শ্রেষ্ঠ নারীশক্তির প্রকাশ অবশ্যই মীরাবাঈ। দানশীলতার ক্ষেত্রে রাণী ভবানীর নাম তো অতিশয় খ্যাত হয়ে আছে। বড় মন্দির পরিচালনার ক্ষেত্রে রাণী রাসমণির মতো উল্লেখযোগ্য নারী চিরস্মরণীয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে গায়ত্রীদেবীকে বেদমাতা বলা হয়। গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা এঁদের অনুসরণে এযুগের অনেক নারী বেদ-বেদান্ত পুরাণ গিয়ে গবেষণা ও প্রচার করে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছেন। সাধ্বী ঋতম্ভরা ও উমা ভারতীর মতো আধ্যাত্মিক ভাবধারার নারীরাও এযুগের শ্রেষ্ঠ সাধিকা অবশ্যই। আবার কিরণ বেদীর মতো প্রশাসনিক প্রতিভাকেও অনেকেই শ্রদ্ধা করেন। আগেকার দিনে অ্যাথলিট নারী ছিল না, এযুগে পি টি ঊষা, সানিয়া মির্জাকে অনেকেই সমাজে উচ্চ স্থান প্রদান করেন।

একজন সফল পুরুষের পিছনে এক বা একাধিক নারীর যেমন অবদান থাকে, ঠিক তেমনই একজন সফল নারীর ক্ষেত্রেও পুরুষদের সদর্থক ভূমিকা থাকে। আবার নর-নারী উভয়ের সাফল্যের পথেই একাধিক নরনারীর বাধা থাকে। বাধা বিপত্তি ছাড়া কোনও কাজেরই গৌরব থাকে না। কাজেই যারা বাধা দিচ্ছেন তারাও মানুষের জেদ বাড়িয়ে দিয়ে পরোক্ষভাবে সাফল্যে সহায়তাই করে থাকেন। যারা বিকৃত নারীবাদী তারা এই বাধাদানের বিষয়টি নিয়ে সকলকে পুরুষ বিদ্বেষী করে তোলার চেষ্টা করেন। এতে সমাজেরই ক্ষতি হয়। পৃথিবীতে আজ অবধি যত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে তার অধিকাংশই পুরুষেরা করেছে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, শিল্প, চলচ্চিত্র, নাট্য, বাণিজ্য, সংগঠন এর অধিকাংশই পুরুষদের করা। যত যুদ্ধ, যত ভৌগোলিক অভিযানের কষ্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষেরাই করেছে। তাই পুরুষেরা আপন যোগ্যতা বলেই জগতের শাসনকর্তা রূপে গণ্য হচ্ছেন। অনুরূপভাবে যে পুরুষই যত সফল হোক না কেন সে বেড়ে উঠছে মাতৃগর্ভে, পালিত হচ্ছে মায়ের দ্বারাই, কাজেই এক্ষেত্রে নারীরাই চিরকাল এগিয়ে থাকবে। নারী-পুরুষ সর্বাংশে সমান হওয়া প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণেই কখনই সম্ভব হবে না। অন্তর্জগতে নারীই শ্রেষ্ঠ। বহির্জগতে পুরুষই শ্রেষ্ঠ। একটা পরমাণুতে পজিটিভ ও নেগেটিভ দুই প্রকার কণিকা সমসংখ্যক থাকে। বহির্জগতটা ইলেকট্রনের আর অর্ন্তজগতটা প্রোটনের। দুই প্রকার কণিকাই একই রকম হলে বা আকাশে দুটি সূর্য থাকলে সৃষ্টিই হোত না পরমাণুর। জলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত সব। এই কারণেই নারী-পুরুষের কিছু সাদৃশ্য ও কিছু বৈসাদৃশ্য ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। নারী সাধকদের তা মেনে নিতে হবে। নারীদের বড় একটা অংশ প্রগতির নেশায় অত্যধিক অহংকারী হয়ে পড়াতেই পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক নারীবাদীদের স্মরণে রাখতে হবে যে সেযুগেও রাণী লক্ষ্মীবাঈরা ছিলেন। সেযুগেও ডাকিনী যোগিনী সাহসিনী ব্রজ-গোপী কারা ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ যুগের মতো মাত্রা ছাড়াতেন না। ফলে লম্পট পুরুষেরা এত সহজে শিকার ধরার সুযোগ পেত না। আর পূর্ণ স্বাধীন পুরুষেরাও নন। পরস্পরের অধীনতার মাঝেই কিছু কিছু স্বাধীনতা ভোগ করা— এটাই ভারতীয় পরম্পরা।

স্বাধীনতার নামে একাকী বেপরোয়া জীবন যাপন নর-নারী কারো ক্ষেত্রেই সমীচীন নয়। বাধ্য হয়ে একাকিত্ব, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমি কাউকে তোয়াক্কা করি না আমি দায়-দায়িত্বহীন— এই ভাবধারা ঠিক নয়।

## চৈতন্যযুগের পরবর্তী নতুন ধারার মন্দির

*পর্ব — ১৪*

# চেঁচুয়া-গোবিন্দপুর রাধাগোবিন্দ মন্দির

ডঃ প্রণব রায়

পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার অন্যতম উল্লেখযোগ্য মন্দির হলো চেঁচুয়া-গোবিন্দনগর গ্রামে গোঁসাইদের রাধাগোবিন্দের ‘পঞ্চরত্ন’! সরেজমিন অনুসন্ধানে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস জানা গেছে, তাতে জানা যায়, এখানকার গোস্বামীবংশের পূর্বপুরুষ প্রাণগোবিন্দ গোস্বামী ওড়িশার যাজপুর থেকে গোবিন্দনগরে প্রথম আসেন। তাঁর বংশধর নন্দনন্দন দেবগোস্বামীকে পাঁশকুড়া থানার কাঞ্চনা গ্রামনিবাসী বৃন্দাবনচন্দ্র মান্না এই মন্দিরটি দান করেন।

এই সুদৃশ্য ‘পঞ্চরত্ন’ মন্দিরটির মিস্ত্রী ছিলেন দাসপুর-সূত্রধরগোষ্ঠীর সাফলরাম চন্দ। ১১৮৮ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮১ খৃস্টাব্দে তিনি এটি তৈরি করেন। মন্দির প্রবেশপথের তিনটি ‘ইমারতি’ থাম এবং ‘দরুন’ খিলান আছে। গর্ভগৃহের পূর্বে ও দক্ষিণদিকে দুটি প্রবেশপথ আছে। পূর্বদিকের প্রবেশপথে কাঠের দরজার কারুকার্য খুব সুন্দর। এধরনের কারুকার্যযুক্ত দরজা এ অঞ্চলে বহু আছে। দারুভাস্কর্য বা কাঠের কারুকার্য সেকালে এই অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং সুদক্ষ কারিগরেরা এখানে এইসব কাজ করতেন।

রাধাগোবিন্দের এই ‘পঞ্চরত্ন’ মন্দিরে ‘টেরাকোটা’র কাজ উচ্চমানের যা দর্শকদের দারুণভাবে আকর্ষণ করে। দেব-দেবীবিষয়ক লীলা ও সেকালের সামাজিক দৃশ্য ‘টেরাকোটা’-ফলকে এই মন্দিরের দেওয়ালে সন্নিবেশিত রয়েছে।

ভিত্তিভূমি সংলগ্ন নীচের অংশে রয়েছে পরিচিত সামাজিক দৃশ্যপট, যেমন বন্দুকহাতে সাহেবের শিকার, হাতির ওপর চড়ে বন্দুকধারী শিকারী, অশ্বারোহী দুই সৈনিকের যুদ্ধ, হার্মাদ রণতরী, রণতরীর পাশে সাগরে হাঙরমুখ, মুঘলসেনার যুদ্ধযাত্রা, কাম্পাসে জমিদার—সামনে-পেছনে লোকলস্কর, নীচে শিকারী কুকুর, ভালুকনাচ, দ্বিতল অট্টালিকার একটি কক্ষে চেয়ারে উপবিষ্ট এক নারীমূর্তি, হুঁকাপানরত এক সাহেব ও পাশে দণ্ডায়মান তার দুজন অনুচর প্রভৃতি সামাজিক দৃশ্য এখানে বহু ফলকে রূপায়িত হয়েছে।

**বাংলার মন্দিরে মন্দিরে**

রাধাগোবিন্দ মন্দির

ওপরের দিকে ক্রমশ রয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর লীলাদৃশ্য। রামরাবণের যুদ্ধ—প্রথমে রাম, তাঁর পেছনে লক্ষ্মণ ও পরে বিভীষণ— মুখোমুখি দশানন (রাবণ) ও তার পেছনে তরবারি হাতে দুজন রাক্ষস। এরপর লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সীতাহরণের পূর্ববর্তী দৃশ্য—কুটিরে সীতা, সন্ন্যাসীবেশে রাবণ। কৃষ্ণলীলার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কয়েকটি দৃশ্য চিত্তাকর্ষক। কার্ণিশের নীচে ও দুপাশে ছোট্ট ছোট্ট কুলুঙ্গিতে বহু টেরাকোটা আছে। এর মধ্যে কার্ণিশের নীচে আটটি বড়ো ‘টেরাকোটা’-ফলক—সম্ভবত প্রভু নিত্যানন্দের পার্ষদ গোপালের। এইরকম আটটি বড়ো টেরাকোটা-ফলকে মূর্তি আমরা দাসপুর থানার শোওদা গ্রামে ধাকারারের ‘নবরত্ন’ মন্দিরে লক্ষ করেছি। এই মন্দিরে উল্লেখযোগ্য আর একটি ‘টেরাকোটা’-ফলক হলো, কার্তিক গণেশাদিসহ সপরিবার দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী। এই মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি বাংলার প্রায় সব ‘টেরাকোটা’-মন্দিরে লক্ষ করা যায়। রাধাগোবিন্দের এই ‘পঞ্চরত্ন’ মন্দিরে ফুল লতা-পাতার সুন্দর সুন্দর নক্‌শা-ফলকও লক্ষ করা যায়।

পূর্বদৃষ্ট এই মন্দিরের সম্প্রতি এবং আগে সরকারি বেসরকারি সংস্কার ও হস্তক্ষেপের ফলে বর্তমানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের তেমন কোনও পরিবর্তন না হলেও পূর্ব রূপ ও পরিবেশ এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

# মকর সংক্রান্তি

**নবকুমার ভট্টাচার্য**

পৌষের সংক্রান্তি হলো উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। আমাদের দেশে সেই সনাতন যুগ থেকে উত্তরায়ণ কালকেই যাবতীয় শুভ কাজের প্রশস্ত সময় বলে মনে করা হয়। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিকেই বলে মকর সংক্রান্তি। এই মকরসংক্রান্তি উপলক্ষ্যেই হয় গঙ্গাসাগরের মেলা। সাগরদ্বীপে হয় এই মেলা। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরবন অঞ্চলের এই দ্বীপটির প্রাচীন নাম শ্বেতদ্বীপ। এর দক্ষিণাংশে গঙ্গা যেখানে সাগরের সঙ্গে মিলেছে, সেই স্থানটির নামই গঙ্গাসাগর। সামনে আদিগন্ত সমুদ্র, পেছনে শ্যামল বনানী। গঙ্গাসাগর একটি মহাতীর্থ। যুগ যুগ ধরে সাগরতীরে মকর সংক্রান্তিতে তাই পায়ে পায়ে মোক্ষকামী মানুষের এত ভিড়। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন এই ভয়াবহ সাগরদ্বীপকে স্মরণে রেখে। অবশ্য তখন সাগর ছিল গভীর জঙ্গলে ঘেরা। একদিকে ছিল বাঘের ভয় আর অন্যদিকে দস্যুদের অত্যাচার। খরস্রোতা নদীতে কুমিরের ভয়ও কিছু কম ছিল না। সেদিন গঙ্গাসাগর তীর্থ ছিল মরুতীর্থ হিংলাজের চেয়েও দুর্গম। তাই বলা হোত— 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'। তবুও অনাদিকাল থেকে আজও মানুষ ছুটে যায় গঙ্গাসাগরে। রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে ঋষি বশিষ্ঠ, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, গৌতম মুনি থেকে আধুনিক যুগের প্রণবানন্দ, ঠাকুর ওঁঙ্কারনাথ পর্যন্ত ছুটে গিয়েছেন সাগরে কীসের টানে! আর সেই থেকেই বহমান সংস্কৃতির সঙ্গে আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে আসেন পৌষ সংক্রান্তিতে। পুণ্যস্নান আর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন কপিল মুনির উদ্দেশে।

পৌষের মকর সংক্রান্তির গঙ্গাস্নান মানুষের কাছে এক মুক্তির আবেদন নিয়ে আসে। মকর সংক্রান্তির সঙ্গে সাগরসঙ্গমে পুণ্যস্নানের এক আধ্যাত্মিক যোগ রয়েছে। এই দিনেই সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র মুক্তিলাভ করেন। এক নৈসর্গিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উৎসব হলো মকর সংক্রান্তি। এদিন থেকেই সূর্য দক্ষিণায়ণ থেকে উত্তরায়ণের দিকে যাত্রা শুরু করে। এদিন থেকেই তাই রাত্রি অর্থাৎ অন্ধকার কমতে থাকে, অন্যদিকে আলো অর্থাৎ উজ্জ্বলতা বাড়তে থাকে। সৃষ্টি যেন পুনরায় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা করে। এজন্যই সুপ্রাচীনকাল থেকে জ্ঞানরূপ আলোর উপাসনায় রত ভারতীয় জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। মকরসংক্রান্তির দ্বিতীয় সংকেতটিও গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে পৃথিবী থেকে সূর্যের যাত্রা বা গতিপথ বদলের সঙ্গে যে নৈসর্গিক ভাবনা জড়িয়ে রয়েছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এনিয়ে বিভিন্ন রকমের উৎসব পালন করা হয়। এদিন থেকেই দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পালিত হয় অন্নোৎসব পোঙ্গল। অসমের মাঘবিহু উৎসবের মুখবন্ধ এই দিনে। গুজরাটে এই দিনে শস্যোৎসব পালনের অনুষঙ্গ হিসেবে সূর্য দেবতার পুজোর দ্যোতক স্বরূপ ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ করার রেওয়াজ রয়েছে। ড. পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর 'পূজা-পার্বণের উৎসকথা' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'নতুন শস্য ঘরে উঠলে আন্দোৎসবের রেওয়াজ বিশ্বজনীন এবং তাঁর বয়সও অনেক হাজার বছর। কৃষির উদ্ভবের পর থেকেই এই শস্য উৎসবের ধারা প্রচলিত হয়েছে সমস্ত দেশে ও সমাজে। সেই বিশ্বজনীন ঐতিহ্যেরই ধারাবাহী আমাদের পৌষসংক্রান্তির বিভিন্ন উৎসব।' কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতেই বা কেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অর্থাৎ যে যে জায়গায় প্রধান খাদ্যই হলো ভাত— আনন্দের উৎসবের প্রথা প্রচলিত রয়েছে? এখন সূর্যের উত্তরায়ণ মাঘের শেষ সপ্তাহে ঘটলেও হাজার দুয়েক বছর আগে তার তারিখ ছিল পৌষের শেষেই। ওই প্রাচীন আমল থেকেই কালচক্রের পরিবর্তনের পটভূমিতে এই উৎসব পালিত হতে শুরু হয়েছিল সম্ভবত সেইসব অঞ্চলে, যেখানে আমন ধান ফলে এবং পৌষ মাসে তা গোলায় ওঠে। সূর্যের ওই কক্ষ পরিবর্তন উপলক্ষে তার উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদনেরই প্রতীক বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সূর্যের সঙ্গে শস্যের সম্পর্কের কথা সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষ জেনে এসেছে। সূর্য যে কৃষির দেবতা তা ঋগ্বেদে রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে (৭।৩৬।১) সূর্য বর্ষণ করেন। কথাটা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে— যে রশ্মি সমূহের দ্বারা আদিত্য তাপ দেন তাই দিয়েই পর্জন্য বর্ষণ করেন। মনুস্মৃতি গ্রন্থে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে— 'আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততো প্রজাঃ (৩।৭৬)।' অর্থাৎ আদিত্য থেকে জাত হয় বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে অন্ন আর অন্ন থেকে প্রজা। কাজেই শস্য সূর্যের উপর নির্ভরশীল। মহারাষ্ট্রে একে তিল উৎসব বা তিল সংক্রান্তি বলা হয়। ঘরে ঘরে আগের দিন রাতে তিলের বিভিন্ন প্রকার নাড়ু তৈরি হয়। ভোরে স্নান করে তারা ওইদিন তিলের নাড়ু খায়। আয়ুর্বেদেও রয়েছে এই সময়ে তিল খেলে শরীরের শুষ্কতা দূর হয়। পাঞ্জাবে একে লোহড়ী উৎসব বলা হয়। এই উত্তরায়ণ বা মকরসংক্রান্তি উপলক্ষ্যেই হয় গঙ্গাসাগরের মেলা। সূর্যের অয়ন অর্থাৎ গতিপথ দুটো— উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ। উত্তরায়ণ হলো দেবযান পথ। যে পথের শেষে রয়েছে আত্মার বন্ধন মুক্তির সন্ধান— 'তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মবেত্তাদের ব্রহ্মলাভের পথ হলো এটা। দক্ষিণায়ণ হলো উল্টোপথ। এপথে গেলে আবার মানব জন্ম লাভ হয়। ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু হয়েছিল এই দিনেই।

পৌষের সংক্রান্তি হলো উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। উত্তরায়ণের আর এক নাম মকর। এদিন থেকে সূর্য মকর রাশিতে যায়। কামশক্তি মকরকে আর মাথায় চড়তে না দেওয়ার প্রার্থনা করা হয় এই দিনে। গঙ্গার বাহন হয়ে সে গঙ্গামায়ের বশীভূত হয়ে তাঁর পায়ের তলায় আশ্রয় নিক।

পূর্ববাংলায় এই তারিখে বাস্তুপুজোর যে প্রথা রয়েছে সেখানে মকরের বিকল্পে মাটির কুমির বলি দেবার রীতি সম্ভবত এই আদিম ভাবনার সূত্রবাহী। পৌষসংক্রান্তির বিচিত্র ধরনের উৎসবের এসব তো হলো একটি দিকের কথা। অন্যদিকটির বৈচিত্র্যও বড় কম নয়। পিঠেপুলি পায়েস ইত্যাদি অধুনা দুর্লভ খাবারগুলি তৈরি এই পৌষ উৎসবের অঙ্গ। পশ্চিমবাংলায় নানা জায়গায় মকরসংক্রান্তির আগের দিন আমন ধানের কেটে আনা গুছিকে পুজো করেন মেয়েরা, যার নাম আওনি বাঁওনি। তুষতুষলি ব্রতোদ্যাপনও এইদিন। রাঢ় বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রচলিত টুসু দেবীর পুজোও এই তিথিতে সাঙ্গ হয়। আর গঙ্গাসাগরের সাগরমেলা তো ভারতের প্রধান কয়েকটি ধর্মমেলার অন্যতম।

হোতু-কোতু উপাখ্যান

# কাছের মানুষ বিবেকানন্দকে নিয়ে অনুষ্ঠান

হোতু ঠিক করেছিল বিবেকানন্দের জন্মের দেড়শো বছর উপলক্ষে দুদিনের অনুষ্ঠানে করবে ছোটোদের নিয়ে। নিজের লোকজনকে আগেই বলেছিল। সকলে জানিয়েছে, ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিন। আমরা আছি সবসময়। প্রথমদিন অনুষ্ঠান শনিবার বিকেলে, ছোটোরা অনুষ্ঠান করবে। যেসব গান বিবেকানন্দের পছন্দের ছিল তা গাওয়া হবে। বিবেকানন্দের লেখা থেকে আবৃত্তি করবে। ‘আমার বন্ধু বিবেকানন্দ’ এই নামে বক্তৃতা হবে। সব শেষে বিবেকানন্দের জীবনের গল্প বলবেন এমন একজন যিনি ভালো লেখেন বলেন। পরের দিন বিবেকানন্দের ছবি আর বাণী নিয়ে প্রভাতফেরী হবে। সামনে ছোটোরা থাকবে। পিছনে বড়োরা। দুতিনটি গান পর পর গেয়ে যাওয়া হবে। কোনও স্লোগান থাকবে না পদযাত্রায়। শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। সকাল আটটায় প্রভাতফেরী শুরু হবে। শেষ হবে দেড় ঘণ্টাবাদে। সকলকে টিফিন দেওয়ার পর বাড়ি ফেরার ব্যাপারটা তদারক করতে হবে। বিকেল তিনটেয় হবে ছবি আঁকার আসর। এক ঘণ্টায় তা শেষ হওয়ার পর সন্ধে ছ'টা থেকে শেষ অনুষ্ঠান। ছোটোদের পুরস্কার দেওয়া হবে। ছোটোদের মধ্যে থেকে পাঁচজন বলবে বিবেকানন্দ সম্পর্কে। গানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হবে।

হোতু বলেছে, ‘আমরা লোকশিক্ষক ও জননায়ক বিবেকানন্দের কথা তুলে ধরবো। দেশকে আর দেশের মানুষকে চেনা জানার জন্যে কীভাবে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছেন সেকথা বলা হবে। সেই সঙ্গে তাঁর ছেলেবেলার কিছু ঘটনা।’ ছবি আঁকা হলো কয়েকদিন ধরে। রজত বিপুল সোমনাথ দেবজিৎ ঋত্বিক আশিস দীপায়ন মৈনাক এঁকে ফেলল ছবি অনেকগুলো। কিছু সাদা কালো, কিছু রঙিন। ছবির নিচে কি লেখা হবে তা ঠিক করল নীতিশ আর শুভব্রত। ক্যালিগ্রাফিতে দক্ষ সোমনাথ আর দেবজিৎ চটপট লিখে ফেলল। সাজানো হলো ছবি বোর্ডে। ঝলমল করে উঠল চারদিক। আটজনে চল্লিশটি ছবি এঁকে অনুষ্ঠানকে অন্যরকম করে তুলল। হোতু জানতে চাইল শিল্পীদের কাছে, ‘যদি ছবি কেউ কিনতে চায় বিক্রি করা যাবে কি?’ শিল্পীরা জানাল, ‘সেরকম সুযোগ এলে বিক্রি করবেন। তাতে অনুষ্ঠানের খরচ উঠবে কিছুটা।’ ছবিগুলো টাঙানো থাকবে দুদিনই। শেষদিনে ছোটোদের আঁকা ছবিগুলো চটপট ঝোলাবার ব্যবস্থা করল সোমনাথরা।

বিবেকানন্দের লেখা আর তাঁর সম্পর্কে লেখা কিছু বই আনিয়ে রাখা হয়েছিল। ছোটোদের প্রত্যেককে বই উপহার দেওয়া হবে— ঠিক হয়েছিল আগেই। বিবেকানন্দের বাণী আর ছবি সাজিয়ে তৈরি কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করল অর্জুন। কোতু চিকলি শিটু ভার পেলো খাবার-দাবার দেওয়ার। তাদের সাহায্যের জন্যেও রইল পাঁচজন। হোতুর কাজের মধ্যে থাকে শৃঙ্খলা। সব কাজ ঠিক সময়ে হবে। হাঁকডাক করে দেখানোপনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে। হোতুর বিভিন্ন কাজে সাহায্যের লোকজন রয়েছে। সব জেনে বুঝে নিয়ে কাজ করে তারা। পরিকল্পনার পর আনুমানিক কত খরচ লাগবে হিসেব করা। টাকা কীভাবে আসবে সেটাও ভাবতে হয়। হোতু একটা কথা মানে, ভালো কাজের উদ্যোগ টাকার অভাবে আটকায় না।

অনুষ্ঠান হলো নতুন বছরের প্রথম শনিবার আর রবিবার। অনেককে নিয়ে বহুরকম কাজ। কোতু মাঝে মাঝে রেগে যায়। হোতু বলে তাকে, ‘একটু চুপ করে বসো। জোরে জোরে শ্বাস নাও। তারপর কিছু খাবার খাও। সকলে মিলেমিশে কাজ করার সময় একটুতে রেগে গেলে চলে! কাজ করতে গেলে ভুল সকলেরই হয়। মানিয়ে নিতে না পারলে গোলমাল। স্বামীজীর জন্মের দেড়শো বছর পালন হচ্ছে। আমাদের অধৈর্য অসহিষ্ণু হলে চলবে? ছোটোদের জন্যে অনুষ্ঠান। রাগলে চলবে না কোতু।’

অর্জুন উঠেপড়ে লেগেছে। বিপুল উৎসাহে কাজ করছে। সকলের সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার। রুচিবান। দায়িত্ব পালন করে ঠিকভাবে। অন্য জায়গায় দরকার পড়লে ছুটে যায়। তার পাশাপাশি ছবি তোলার কাজও চলেছে।

রবিবার অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর একটা ছোট্ট ছেলে হোতুকে একটা শুভেচ্ছাপত্র উপহার দিল। ছবি এঁকে তাতে লিখেছে ‘তুমি বিবেকানন্দকে আপন করে নিয়েছো। আমরাও তাই করবো। তিনি দূরের মানুষ নয়, কাছের মানুষ। আপনজন।’ ছেলেটির নাম সুমানস মুখোপাধ্যায়।

অর্জুন ততক্ষণে একটা ছবি তুলে নিয়েছে সুমানস আর হোতুর।

**কৌশিক গুহ**

## বই কথা কই

# স্বামীজীও চাইতেন সকলে পড়াশোনা করুক

স্বামী বিবেকানন্দ পড়াশোনা ভালোবাসতেন। চটপট পড়া আর মনে রাখার অভ্যেস তৈরি হয়েছিল তাঁর ছেলেবেলাতেই। শেখার ইচ্ছে জানার আগ্রহ খুব বেশি ছিল। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত বই পড়তেন। স্মৃতিশক্তি খুব জোরালো থাকায় পড়ার পর মনে রাখতে অসুবিধে হোত না। বহু বিষয়ে আগ্রহ ছিল। পরে নিজের হাতে খুব কম লিখলেও বক্তৃতা দিয়েছেন অনেক। সেসব বক্তৃতার মধ্যে নানারকম চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। তা থেকে বোঝা গেছে তাঁর পড়া রয়েছে কত বিষয়ের বই। এছাড়া যোগ হয়েছিল বাস্তব জ্ঞান। জীবনকে মিলিয়ে দেখেছিলেন অভিজ্ঞতা আর অর্জন করা বিদ্যার মাধ্যমে। সন্ন্যাস নেওয়ার পর এক গুরুভাই সারাদিন পড়াশোনা নিয়ে থাকতেন বলে আরেক গুরুভাই চটে গেলেন। পড়াশোনায় ব্যস্ত গুরুভাইয়ের নাম স্বামী অভেদানন্দ। স্বামীজী বললেন, 'ও সারাক্ষণ পড়ে তাতে তোর কি? তোর সব বাসন রেখে দে, আমি মেজে দেবো।' স্বামীজী বলতেন পরে সকলকে, 'পড়ো-লড়ো-গড়ো।' তিনি ছিলেন সত্যিকারের লোকশিক্ষক। পড়াশোনা সকলের করা দরকার— এটা বলতেন জোর গলায়।

**বইমিত্র**

## প্রশ্নবাণ

১. স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমের (সন্ন্যাস নেওয়ার আগে) নাম কি ছিল? তাঁর ভাইদের নাম?
২. তাঁকে 'স্বামীজী' বলা হোত কেন?
৩. তাঁর গুরুভাইদের নাম?
৪. বিবেকানন্দ কত বছর সন্ন্যাসী ছিলেন?
৫. তাঁর জীবনাবসান কবে এবং কোথায়?

**উত্তর :** ১. নরেন্দ্রনাথ দত্ত। মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ২. উত্তর ভারতের ভক্ত মানুষরা তাঁকে সম্বোধন করতেন 'স্বামীজী' বলে। ৩. স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। ৪. পনেরো বছরের কিছু বেশি সময়। ৫. বেলুড়ে। ৪ জুলাই ১৯০২।

## অলোক-লোকের আলোক-দিশারী

*ভবানীপ্রসাদ মজুমদার*

ভূলোকে দ্যুলোকে প্রাণের পুলকে বাজে জীবনের ছন্দ
ভোরের আকাশে শুকতারা ভাসে, কে হাসে? বিবেকানন্দ।
ভুলেই আপোস, তরুণ তাপস, আলোর দেবতাদীপ্ত
বঞ্চিত-বুকে সঞ্চিত-দুখে দাঁড়ালো সে রুখে দৃপ্ত।
তুমি ভারতের প্রাণের প্রতিভূ, প্রাচী-প্রতীচীর বন্ধন
অলোক-লোকের আলোক-দিশারী, নিতিনন্দিত নন্দন।
সাধনার শুরু, গদাধর গুরু, আসলে শিবের অংশ
তিনি রাম, তিনি কৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।
জাত চলে যায় কীভাবে, বুঝতে হুঁকোতে দিয়েছো টান
হাজার খুঁজেও একটি জাতিরই পেয়েছিলে সন্ধান।
সে-জাতির নাম 'মানবজাতি', শ্রেষ্ঠ 'মানবধর্ম'
ধর্মে-ধর্মে বিভেদ করাটা নয় সমীচীন কর্ম।
তোমার ধর্মে তুমি আছো মেতে; আমার ধর্মে আমি,
সর্বধর্মসহিষ্ণুতার চেয়ে নেই কিছু দামী।
বিশ্বধর্মমহাসভামাঝে দিয়েছিলে সেই শিক্ষা
সর্বধর্মসমন্বয়ের মন্ত্রেতে দিলে দীক্ষা।

সবার উপরে মানুষ সত্য, জীবসেবা শিবসেবা
তোমার মতন সহজ ভাষাতে বোঝাতে পেরেছে কেবা?
বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ, বিশ্বপ্রতীক তাই
বিশ্ববিজয়ী বিশ্ববাসীকে বলে ছিলে 'বোন-ভাই।'
বিশ্ববিবেক বিবেকানন্দ বিশ্বসেবার ব্রতে
মানবপ্রেম আর ঈশ্বরপ্রেম মেলালে বিবেক-স্রোতে।
তোমার চোখেতে সবাই সমান, সকলেই জগদীশ্বর,
বিবেক-বাণীতে দেবতা মানুষ, আর মানুষই ঈশ্বর।।

# নারী মুক্তির অন্য দিক

(১ম পর্ব)

**এষা দে**

বিদেশে বেড়াবার নেশায় অনেক জায়গায় গেছি। যেখানেই গেছি, নারী হিসেবে আমাদের দেশের নারীদের থেকে বিদেশে নারীর অবস্থান দেখবার চেষ্টা করেছি। প্রথমেই আমি ইউরোপ ভ্রমণ প্রসঙ্গে আসব।

ইউরোপে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বে সেখানে সবই উন্নত হওয়ার কথা। কিন্তু সেখানেও অনেক তফাৎ আছে। বেশিরভাগ খৃস্টধর্মাবলম্বী হলেও তাদের মধ্যে বিভাজন আছে। ইউরোপের রাজ্যগুলি বেশি উন্নত। তবে মেয়েদের অবস্থান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, আর্থিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই আবদ্ধ। এর বাইরে যেতে পারে না মেয়েরা। ইউরোপে মেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। যদি অবশ্য তার মেধা থাকে। দশ ক্লাস অবধি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তারা পৌঁছতে পারে। স্নাতকোত্তরে পড়বার সুযোগ সম্পূর্ণ মেধাভিত্তিক। এক্ষেত্রে ঝাড়াই বাছাই হয়। এখানকার সামাজিক পরিস্থিতি আলাদা। আমাদের দেশে মেয়েদের অবস্থান পরিবারভিত্তিক। এদেশের পরিবার মেয়েদের সাপোর্ট দেয়। অধিকাংশক্ষেত্রে বাইরে কর্মরতা নারীদের সন্তানরা তাদের ঠাকুমা দিদিমার কাছে অনেক নিশ্চিন্ত। ওই দেশে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকলেও কিন্তু পরিবারের কোন সাপোর্ট নেই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। যে যার নিজের দায়িত্বে। তারা মা-বাবা শ্বশুর-শাশুড়ির ওপর নির্ভরশীল নয়। ওখানে অবশ্য শিশুদের দেখার জন্য ক্রেশ আছে। মেয়েদের কাজ করতে হলে বিকল্পের ওপর নির্ভর করতে হয়। আমাদের এখানে ধরে নেওয়া হয় যে প্রবীণ প্রজন্ম রয়েছে। কিন্তু ওখানে মেয়েদের এত বেশি স্বাধীনতা, সাধারণ মেয়েরা কাজ করতে চায়, কিন্তু তারা পরিবার ও সন্তান চায়না, যদিও পরিবারের পক্ষে রাষ্ট্রও অনেক সাপোর্ট দেয়। আমারই এক ছাত্রী আমস্টার্ডাম-এ কাজ করে, গবেষণা করে। অনেকদিন পরও বিয়ে করে, সন্তান হয়। ওদের দেশে গর্ভবতী মহিলাদের অনেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে ওখানকার রাস্তার অবস্থান সম্পর্কে একটু জানিয়ে রাখি। জায়গাটা সমুদ্রের থেকে নিচু হওয়ায় সরু সরু রাস্তা। ফলে গাড়ি চলার অসুবিধে। সাইকেলে যাতায়াত করতে হয়। সেই কারণে গর্ভবতী মহিলাদের নিয়ে একটা ঠাট্টা প্রচলিত আছে যে, সাইকেলে প্রসবকালীন অবস্থায় গর্ভিনী মা নিজে সাইকেলে হাসপাতালে যাবে, ছ' ঘণ্টা বাদে সদ্যোজাত বাচ্চা শিশু নিয়ে তাকে সাইকেলে করে ফিরতে হবে। গর্ভবতী মায়েদের এখানে কঠোর জীবন। সদ্য প্রসূতির

অঙ্গনা

পাশে কেউ না থাকলেও বাড়ি ফিরে হাসপাতাল থেকে সে মেট্রন রাখতে পারে। কিছুদিন পর্যন্ত ওরা দেখভাল করবে একটা শর্তে, যদি দম্পতির মেডিকেল ইনসিওরেন্স ভাল হয়। ওখানে পাড়ায় পাড়ায় সেবাকেন্দ্র আছে। ওখানে মায়েদের সন্তান প্রসব এবং পালন দুটোই খুব কঠিন ব্যাপার। ফলে ইদানিংকালে সন্তান ধারণ করা কমে গেছে। সার্বিকভাবে দেখা যাচ্ছে, একটা রাষ্ট্রে যদি সন্তান কম জন্মায়, তাহলে জনসংখ্যায় ভারসাম্য থাকবে না। বিশেষ করে ইউরোপে। কিন্তু ক্যাথলিক দেশ, যেমন ইটালি, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ধর্মীয় আদেশ সাধারণ মানুষ জানেন না। জার্মানি যখন বিভাজিত ছিল, তখন জন্মনিয়ন্ত্রণে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবের জন্য সন্তান সংখ্যা ছিল কম। এখন দু' জার্মানি এক হয়ে ভারসাম্য হয়েছে। সংখ্যা কমে যাওয়ায় অন্য দেশ থেকে লোক নিয়ে আসা হয়। তারা অনুন্নত দেশ থেকে আসছে। যে কারণে এতদিন যে উন্নতি হয়েছিল, এদের আসার ফলে উন্নতির ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে নারীমুক্তির আধিকার, মাতৃত্বের অধিকার, কেরিয়ার করার স্বাধীনতা কিন্তু এক সমস্যা ডেকে আনছে। সনাতন সমাজব্যবস্থায় পৃথিবীর সর্বত্র যে শ্রম বিভাজন ছিল, একটা সংসারে পুরুষ পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্বে আর মহিলারা সন্তান পালন ও সংসার দেখাশোনা করার দায়িত্বে। কিন্তু এখন পুরুষ-মহিলা কর্মক্ষেত্রে এক হয়ে যাওয়ায় সংসারে সন্তান ধারণ ও প্রতিপালন সমস্যা সঙ্কুল হয়ে যাচ্ছে।

ইংলন্ডের ব্রাডফোর্ড-এ (মিনি পাকিস্তান) দম্পতি পিছু ইংরেজ সন্তান একও নয়। কিন্তু ভারতীয় যারা যাচ্ছে তাদের সন্তান সংখ্যা ২৫ শতাংশ। পাকিস্তানিদের ৭০ শতাংশ, বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ সন্তান আছে। অনুন্নত দেশ থেকে যারা আসছে, সেখানে জার্মানি বা ইংলন্ডে যে স্রোত আসছে, তাতে ফল হচ্ছে এটাই যে আমরা যেগুলি থেকে মুক্তি পেতে চাই; সেগুলিই ঢুকে পড়ছে। কোনও মহিলার পক্ষে একাধিক সন্তান মানুষ করার ক্ষমতা নেই। দেখা যাচ্ছে স্কুলগুলোতে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষজনের সন্তানরা শিক্ষা পেতে যাওয়ার ফলে স্কুলের মান নেমে যাচ্ছে। বিদেশে মহিলাদের স্বাধীনতা আছে ঠিকই; কিন্তু এই স্বাধীনতা বা নারীমুক্তিই আনছে নানা সমস্যার। মেয়েদের মুক্তির সঙ্গে মানব সমাজের স্থিতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক আছে। কিন্তু সন্তান সংখ্যা যদি প্রয়োজনের তুলনায় কমে যায়, সেটা বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। একাকী মা-দের ঘরে বাইরে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়। একেই তো নিউক্লিয়ার পরিবার অতিরিক্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে মেয়েরা একা। আমাদের দেশে সন্তানসংখ্যা অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় অন্য ধরনের সমস্যা। আমাদের ধারণা বিদেশে বিদেশে মেয়েরা কত স্বাধীন, স্বাবলম্বী এবং সুখী। কিন্তু আমরা খতিয়ে দেখি না যে সে দেশের মেয়েরা কত সমস্যাজড়িত। ওদের দেশে পরিবারের ভিত্তি নেই, একত্র থাকার কোনও ব্যাপার নেই। সেক্ষেত্রে একটি মেয়ের পক্ষে সংসার সামলানো খুবই কষ্টকর। আমাদের দেশেও এই প্রভাব পড়ছে। এখানে সন্তান মানুষ করতে পারে না এমন মা আছেন। কিন্তু ওদের দেশে আবার সন্তান উৎপাদনই হচ্ছে না। তবু আমাদের দেশে এ সমস্যা মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরে, কিন্তু বিদেশে সমস্যা সার্বিক। (আগামী পর্বে সমাপ্য) *অনুলিখন : ইন্দিরা রায়*

# যাহাই বারো, তাহাই তেরো!

**ভাই ২০১৩ সাল,**

তোমাকে স্বাগত। জানি না তুমি আমাদের বন্ধু হয়ে উঠবে কিনা, জানি না ইতিহাসের পাতায় কী লেখা থাকবে তোমার পাশে। বদলকে মেনে নিতেই হয়। তাই তোমাকে স্বাগত তো জানাতেই হবে।

তেরো, তোমার গায়ে আবার বিলিতি কুসংস্কার লেগে আছে। তেরো মানেই অপয়া। কিন্তু ভয় নেই, অনেক বিপত্তি সত্ত্বেও দিল্লীর তেরো নম্বর তালকোটরা রোডের বাসিন্দা থেকে দেশের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি হয়ে শ্রীযুক্ত প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করে দিয়েছেন 'তেরো মোটেও আনলাকি নয়'।

এও তো একটা বদল। থার্টিনের ইমেজ বদল। এই রাজ্যেও তো নাকি ইমেজ বদল হয়েছে। যদিও সেটা বোঝা মাঝে মাঝেই মুস্কিল হয়ে যাচ্ছে। ভাই তেরো, আমার মনে একটা প্রশ্ন কেবলই ঘুরপাক খায়, বদল মানে ঠিক কী? বদলে মানে কি শুধুই বাইরে থেকে পরিবর্তন নাকি ভেতর থেকেও বদলে যাওয়া?

যাই হোক বারো বড্ড মন বিষণ্ণ করে গেল। অনেক কিছু নিয়েই তো সারাটা বছর মেতে থাকলাম। কিন্তু এফ ডি আই নিয়ে যেটা হলো সেটা দেখে মনটা সব থেকে খারাপ। খুচরো ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ একশ শতাংশ হয়ে গেলে কী বিপদ হবে সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। আমার মন খারাপ সেটা নিয়ে নয়। আমার মনে চিন্তার মেঘ জমালো ভারতীয় গণতন্ত্রের 'সংখ্যা-তত্ত্ব'। দেখো লোকসভা কিংবা রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদের দল বিরোধিতা করল কিন্তু ভোটাভুটিতে হেরে গেল। কৃষকের সর্বনাশ নিয়ে যারা গলা ফাটালেন তারাই আবার কংগ্রেসকে জিতিয়ে দিলেন। আর সেটা মুখ বুজে, নিয়ম মেনে, বৈধ ভাবেই মানতে হলো বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের মন্দির সংসদকে।

এসব দেখে এক জ্যোতিষের কাছে গিয়েছিলাম। কেমন যাবে তেরো? এই প্রশ্নটা করতেই তিনি এক কথায় বলে দিলেন, 'যাহাই বারো, তাহাই তেরো'। আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন, এটাই হবে। এটাই হয়ে আসছে। যেমন এগারো সালে আন্না হাজারের ডাকে হাজারে হাজারে মানুষ পথে নেমেছিলেন। 'ম্যায় আন্না হুঁ' টুপিই বিক্রি হলো, কিন্তু কালো টাকা দেশে ফিরল না, অনশনের অনেক ছবি তোলা হলো কিন্তু জনলোকপাল বিল এক ইঞ্চিও এগলো না। উল্টে দেশে 'আম আদমি' নামে আরও একটা রাজনৈতিক দল তৈরি হয়ে গেল। ডজন খানেক নেতানেত্রীর জন্ম হলো। আম আদমির কী হলো? জ্যোতিষজির কাছে গেলাম মনের ভার কাটাতে তিনি উল্টে বাড়িয়ে দিলেন সেটা। বললেন, ২০১৩-তেও দেশের নানা জায়গায় নির্যাতিতা হবেন অনেক নারী। দিল্লী বা পার্কস্ট্রিটের মতো মিডিয়া বহুল জায়গায় হলে অনেক কোলাহল হবে। শীলার দেশে হলে মমতা নিন্দা করবেন এবং মমতার জায়গায় হলে শীলা। কেউ নিজেকে বাঁচাতে ঢাল করে বলবেন, ওটা সাজানো ঘটনা। কেউ পুলিশ আর জলকামান দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেবেন আন্দোলনকে। ধর্ষণের ঠিক কী শাস্তি হওয়া উচিত তা নিয়ে জমে উঠবে নিউজ চ্যানেলের আলোচনা। কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত তা নিয়ে চলবে বিতর্ক। কোনও নেত্রী ধর্ষিতা হলে কত ক্ষতিপূরণ হওয়া উচিত এমন প্রশ্ন তুলে পার্টি অফিসে বসে ক্ষমা চাইবেন বামপন্থী নেতা।

বারো সালের মতো তেরো সালেও প্রতিবাদের শিখা জ্বলে উঠবে। অবশ্য যতক্ষণ মিডিয়ার ক্যামেরা থাকবে। এক মোমবাতির শিখা শত সহস্র হয়ে ছড়িয়ে পড়বে দেশে। আবার সময়ের জল কামানে সেই আগুন নিভে যাবে। সবাই মেতে উঠে নিজের নিজের কাজে। মিডিয়া খুঁজতে শুরু করবে নতুন ধর্ষণ, নতুন গল্প।

আচ্ছা জ্যোতিষ মশাই, ভাল কিছু হবে না? শুধু খারাপ বলছেন কেন? প্রশ্ন করেছিলাম আমি। জবাবে তিনি বললেন, খারাপ কোথায় বলছি। যেটা সত্যি সেটা বলছি। এসবই তো হয়ে আসছে। তাতে কি সত্যিই কারও জীবনযাপনে কোনও ক্ষতি হয়েছে। যারা আক্রান্ত তারা সংখ্যায় কয়েকজন। ১২৫ কোটি ছুঁতে চলা দেশ তো এই ব্যবস্থাতেই ভালো আছে। বিয়ে-শাদি হচ্ছে। শীতে চড়ুইভাতি হচ্ছে। স্বাভাবিক নিয়মেই তো চলছে দেশ কাল সমাজ।

কিন্তু এই রাজ্যে তো পঞ্চায়েত ভোট আছে তেরোর বছরে?

তাতে কী হয়েছে? সব বছরেই কোথাও না কোথাও ভোট থাকে। কেউ জিতবে, কেউ হারবে। কেউ মারবে। কেউ মরবে। কেউ বলবে তেরো অপয়া। কেউ বলবে যারা তেরোতেও জিততে পারে তারা সব পারে। সব পারবেও। তেরোর গোড়া থেকেই অনেক হাসপাতাল, অনেক স্কুল, অনেক চাকরি, বকেয়া ডি এ, সস্তার চাল শুরু হয়ে যাবে। একেবারে যাকে বলে কল্পতরু।

না, আর জ্যোতিষ বচন শুনে লাভ নেই। এতো আমাদের সবার জানা। তবু আশায় আশায় থাকলাম। যদি বাইরে থেকে এবং ভেতর থেকে একই সঙ্গে কোনও বদল দেখা যায় তেরোর বারো মাসে। ভালো থেকো তেরো। ভালো রেখো।

— **সুন্দর মৌলিক**

অতিথি কলম

জে জি অরোরা

# ভারতে হিন্দুত্বকে উৎখাত করতে তৎপর ইউ পি এ

যদিও মার্ক টোয়েনের মতে ভারত হলো মানবজাতির দোলনা যা মানুষের সভ্যতার আঁতুড়ঘর, ইতিহাসের জ্ঞানী, পুরাণের ঠাকুর্দা আর ঐতিহ্যের প্রপিতামহ। যেভাবে দুনিয়া থেকে অন্য সব ধর্ম, সভ্যতা শেষ হয়ে গেছে সেইভাবেই হিন্দু-বিরোধী শক্তি হিন্দু ধর্ম আর সভ্যতাকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিতে সচেষ্ট। ভারতবর্ষ নামে এই দেশে একজনও মুসলমান ছিল না ৭১১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত— যখন মহম্মদ বিন কাশিমের আরবসেনা দেশটাকে আক্রমণ করে। ৯৮৭ খৃস্টাব্দে আফগানিস্তান হাতছাড়া হলো আর বর্তমানে পাকিস্তান বাংলাদেশ বিভক্ত হলো ১৯৪৭ সালে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো যে ১৯৪৭ সালের পর থেকে বিভক্ত ভারতে হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অবক্ষয়ের সঙ্গে ভূমিও সংকুচিত হলো। ১৯৪৭ সালের পর থেকে মাত্র ছয় দশকে দেশের যতটা ভূমির সংকোচন হয়েছে তা এর আগে পর্যন্ত ঘটেনি।

১৯৮৯-৯০ সালে নিজভূমিতে স্বজন হত্যা ঘটেছে এবং মুসলমান অধ্যুষিত কাশ্মীর থেকে হিন্দু উৎখাত হয়েছে এবং হিন্দুরা নিজভূমে পরবাসী হয়ে গেছে। আরও ব্যাপার হলো পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে প্রচুর অনুপ্রবেশ ঘটায় হিন্দুরা নিজ নিজ বাসস্থান হারাচ্ছে আর পরিণামে ভারতের মাটিতেই বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠছে মিনি পাকিস্তান আর মিনি বাংলাদেশ।

অনেক হিন্দুদের আশঙ্কা আগামী মাত্র কয়েক দশকেই মুসলিমরা জনবহুল হয়ে ভারতে হিন্দুদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করবে এবং এর ফলে হিন্দুদের আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যা দশা হয়েছে স্বভূমে সেই দশাই ঘটতে চলেছে।

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতেই হিন্দু ঐতিহ্যের ওপর আঘাত আসছে এবং প্রত্যহই অত্যাচারিত হচ্ছে। ২০০৭ সালে সুপ্রীম কোর্টের সমক্ষে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার হলফনামা দিয়ে রাম ও রামসেতুর অস্তিত্বই অস্বীকার করে হিন্দু বিশ্বাসের ওপরেই আঘাত হেনেছে। যদিও প্রতিবাদের পর সেই হলফনামা সরকার প্রত্যাহার করে নিলেও হিন্দু বিশ্বাসের ক্ষতে কোনও প্রলেপ পড়ল না। হিন্দুদের দুর্দশার কারণগুলি কি কি তা সংক্ষেপে এরকম :

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের মূল কারণ ছিল ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্ব। মুসলমানদের দাবি মেনে পাকিস্তান গঠিত হলো বটে, কিন্তু খণ্ডিত ভারতকে হিন্দুদের দেশ বলে গণ্য করে হিন্দুদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হিন্দুরাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা উচিত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ওপর ধর্মনিরপেক্ষতার এক ছাপ দিয়ে দেশটাকে হিন্দু-বিরোধী, মুসলমান সমর্থক, বিভাজিত এবং জাতীয়তাবিরোধী এক দেশ গঠিত হলো।

এইভাবে ভেজাল ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে ভারত প্রতিদিনই এক মুসলিম সহায়ক, খৃস্টান সহায়ক আর হিন্দু-বিরোধী দেশে পরিণত হচ্ছে। যদিও কোনও ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মের ভিত্তিতে তার নাগরিকদের পুরস্কার বা তিরস্কার কোনওটাই করতে পারে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ২০০৬-এ জাতীয় সম্পদের পর্যদের সভায় ঘোষণা করে বসলেন জাতীয়সম্পদের ওপর অধিকার সর্বাগ্রে থাকবে মুসলিমদের।

যদিও সাংবিধানিকভাবে ভারতের সমস্ত নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং সংবিধানের কোথাও সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘুর কথা বলা নেই বা ব্যাখ্যা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার তথা বহু রাজ্যসরকার সংখ্যালঘু উন্নয়নের মোড়কে অহিন্দুদের জন্য বিশেষ ছাত্রবৃত্তি এবং বিনামূল্যে পড়াশুনাসহ, ঋণের বন্দোবস্ত করেছে। দুনিয়ার অন্য কোনও রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরুরা এমন অবিচারের শিকার হয়নি এবং সংখ্যালঘুরা এমন সুযোগ-সুবিধা পায়নি যেমনটা এদেশে পাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো কীভাবে মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে অবিচার চলছে—

স্বজন নিধন, হিন্দু উৎখাত চলছে কাশ্মীর জুড়ে। পাক-বাংলা সন্ত্রাসবাদীরা ভারতের মাটিতে মিনি পাকিস্তান, মিনি বাংলাদেশ গড়তে চাইছে। দুনিয়ার মিশনারীরা চাইছে ভারতকে খৃস্টান দেশ বানাতে। সরকার হিন্দু মন্দিরের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করছে অথচ মসজিদ বা গির্জার ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। অহিন্দুদের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদ অনুসারে বিশেষ অধিকারের কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩৭০ ধারায় জম্মু-কাশ্মীরকে অর্থাৎ মুসলিমদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

স্বঘোষিত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি সংখ্যালঘু ভোট-ব্যাঙ্ক নিজেদের অনুকূলে ধরে রাখতে নতুন নতুন পরিকল্পনা রচনা করেছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেবলমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুকূলে কতকগুলি নতুন নীতি গ্রহণ করেছেন। ঘোষণা করেছেন প্রতিটি জেলায় সংখ্যালঘু কেন্দ্র, কর্মসংস্থান কেন্দ্র, একটি নতুন হজ-হাউস, আলিগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে এক ক্যাম্পাস গঠন, সংখ্যালঘুদের জন্য এক শিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্র এবং পলিটেকনিক গঠনের কথা। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং রাজ্যের তিরিশ হাজার ইমামদের জন্য প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকার ইমাম ভাতার ঘোষণা করেছেন। এরকম অনেক সংখ্যালঘু আইন তৈরি হয়েছে বহু রাজ্যে।

অবাক হবার কিছু নেই যে, এদেশে চালু

রয়েছে যে ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতা তা তৈরি করেছে সিমি-র মতো, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের মতো সংগঠন যারা এদেশে মুসলিম রাজ কায়েম করতে সদা তৎপর।

কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার, দেশের প্রধান মিডিয়াগুলি এবং বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলির বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে কোনও হেলদোল নেই। অথচ এইসব অনুপ্রবেশকারীরা নিঃশব্দে এদেশ দখল করার নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছে।

পাকিস্তান, বাংলাদেশ (যা আগে হিন্দুরাষ্ট্রই ছিল) ক্রমশঃ মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েই হিন্দু, শিখদের তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু যে সব মুসলমান দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাজন করল তারাই এদেশেই রয়ে গেল। উল্টে ১৯৪৭ সালে এদেশে যত মুসলমান ছিল তা এতদিনে বহুগুণ বেড়ে গেছে।

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী যা হিন্দু-বিদ্বেষী, ভারত বিরোধী তারাই সেখানে শাসন করছে এবং সন্ত্রাসবাদে মদত দিচ্ছে। শতধা ছিদ্রের মাধ্যমে এরা এদেশে রক্ত ঝরাচ্ছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ বহু সন্ত্রাসবাদীসহ তাদের লক্ষ লক্ষ নাগরিককে এদেশে ঢুকিয়ে অস্থিরতার প্রয়াস চালাচ্ছে।

২০০৫-এর ১২ জুলাই এবং ২০০৬-এর ৫ ডিসেম্বর সুপ্রীম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ জানা সত্ত্বেও সরকার বিদেশীদের বিতাড়নের কোনও চেষ্টা চালায়নি। বিতাড়নের বদলে সরকার এদের নাগরিকত্ব পাইয়ে দিয়ে ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করছে এবং পরিণামে দেশের বিভিন্ন বিধানসভা এবং লোকসভা কেন্দ্রে এই বিদেশীরাই নির্ণায়ক শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করছে।

**এন জি ও এবং ধর্মান্তরকরণ**

একদিকে পাক্-বাংলা সন্ত্রাসবাদী এবং অনুপ্রবেশকারীরা দেশটাকে ইসলামিকরণ করে যাচ্ছে, অন্যদিকে বিদেশী অর্থের সাহায্যে খৃস্টান মিশনারীরা এন জি ও-দের মাধ্যমে হিন্দুদের ধর্মান্তর করে খৃস্টানীকরণ করে যাচ্ছে।

১৯৯৯ সালের ৭ নভেম্বর দিল্লীতে বসে পোপ জন পল-২ (দ্বিতীয়) এশিয়াকে খৃস্টান দেশে পরিণত করার উদাত্ত আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, "প্রথম সহস্রাব্দে ইউরোপের মাটিতে দৃঢ়ভাবে খৃস্টান ধর্ম প্রোথিত হয়েছে, তেমনিভাবে দ্বিতীয় সহস্রাব্দে ক্রুশ জয় করেছে আমেরিকা ও আফ্রিকা। একইভাবে তৃতীয় সহস্রাব্দ চাক্ষুষ করবে এই ধর্ম বিস্তার করছে দুনিয়ার বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ মহাদেশ।"

এই ধর্ম বিজয়ের মূল লক্ষ্য হিন্দু অধ্যুষিত রাষ্ট্র ভারত এবং নেপাল। ২০০৬ সালে মাওবাদী, খৃস্টান মিশনারী এবং আই এস আই-এর লোকজনদের বিচরণক্ষেত্র হলো নেপাল।

উত্তর-পূর্ব জয় করে দুনিয়ার বহু ধর্মপ্রচারকারী সংস্থা এনজিও-দের মাধ্যমে ধর্মান্তকরণের লক্ষ্যে এদেশে প্রচুর অর্থ পাঠাচ্ছে। এদের লক্ষ্য লোভ দেখিয়ে বা জোচ্চুরির মাধ্যমে ধর্মান্তর করা। আর ভারতে পুরোপুরি ধর্মান্তকরণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে জোশুয়া প্রোজেক্ট শুরু করা হয়েছে।

**ভয়াবহ মিথ্যাচার**

সবচয়ে ভয়াবহ মিথ্যাচার হলো যে, অধিকাংশ হিন্দু ধার্মিক নেতারা প্রচার চালাচ্ছে সব ধর্ম এক এবং প্রত্যেক ধর্ম-কে সম্মান করা উচিত। এ ধরনের অবাস্তব প্রচার অবশ্যই হিন্দুত্বের বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সেই অজ্ঞতা অন্য ধর্মের মূল্যায়নেও সমস্যা সৃষ্টি করে। এই মিথ্যাচার হিন্দু-বিরোধী শক্তিকে সাহায্য করে এবং ধর্মান্তরের কাজে মদত দেয়। যারা সব ধর্ম এক এমন প্রচার চালায় তারা হয় অজ্ঞ নয়তো ভণ্ড।

তাছাড়া হিন্দুর একতরফা স্লোগান যেমন বসুধৈব কুটুম্বকম (সমগ্র পৃথিবী আত্মীয়) এবং একম্ সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি ('সত্য' এক কিন্তু বহু নাম) ইত্যাদি ভাবনাগুলি হিন্দু বিরোধী শক্তি থেকে যে বিপদ তা ধামাচাপা দেয়। এবং এই শক্তি হিন্দুত্বকে খতম করতেই ময়দানে অবতীর্ণ। ফলস্বরূপ 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি অ-হিন্দুবাদী। তাই যারা ম্যাকলে শিক্ষায় শিক্ষিত তারাই বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং সব ধর্ম এক এই তত্ত্ব প্রচার করে ধর্মান্তরিত হয় আর অন্য ধর্মে বিবাহ করে।

উপরন্তু আন্তর্জাতিকভাবে ভারত শুধু একাই এই উদারতার কথা বলে এবং সেই উদারতার প্রতিদান আশা না করেই। সৌদি আরবে কোনও হিন্দু মন্দির গড়ার অনুমতি যখন পাওয়া যাবে না তবে সৌদি আরবের অর্থে আমাদের দেশে কোনও মসজিদ গড়ার, মাদ্রাসা গড়ার অনুমতি দেওয়া হবে?

**নিষ্ক্রমণের উপায়**

মিথ্যা ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্ব আমাদের মগজ ধোলাই করেছে, আমরা ভীরু হয়েছি, আর আমাদের নতজানু করে দিয়েছে। হিন্দুদেরকে নিজেদের মূল থেকে উচ্ছেদ করেছে এবং আত্মবিস্মৃত করে তুলেছে। হিন্দুরা ছদ্মধর্মনিরপেক্ষবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এইসব ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মের ধারাবাহিক ক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে ভারতকে অ-হিন্দু করে তুলেছে। মিথ্যা ধর্মনিরপেক্ষতাই হিন্দুদের নতজানু করেছে আর সবরকম অবিচারের পাত্র করে তুলেছে। এইসব থেকে নিজেদের মুক্ত করতেই হবে এবং শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমেই ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী জাতি হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে হবে।

হিন্দু-ভারত সবার জন্য সমান দেওয়ানী বিধি প্রণয়ন করে সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদের শর্তাবলী চালু করে এক শক্তিশালী জাতি গড়ে তুলবে। তাছাড়া যেহেতু সংবিধানের, অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিচ্ছিন্নতাবাদকে উৎসাহ দেয়, যা স্বজন নিধনে সাহায্য করে এমন ধারাকে বিলোপ করবে। জম্মু-কাশ্মীরকে মূল ভারতের সঙ্গে সংযোগ করে এক সুতোয় বাঁধবে। সেইসঙ্গে হিন্দু ভারত ১৯৪০ সালে জিন্না দ্বারা উদ্ভাবিত দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা স্মরণে রেখে ভারতভূমিতে আরও পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ তৈরির স্বপ্নকে ধ্বংস করবে।

সমস্ত জাতীয়তাবাদী মানুষ এবং সংগঠন এককাট্টা হয়ে মিথ্যা ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরিয়ে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র গড়ে তা শান্তিময়, সাংবিধানিক ভারত গড়ে তুলবে আইনসম্মতভাবেই। যখন দুনিয়া জুড়ে ৫৭টি মুসলমান অধ্যুষিত রাষ্ট্র রয়েছে, তখন হিন্দু ভারত গড়ার পরিকল্পনায় কেউই আপত্তি করবে না। সংগঠিত প্রচেষ্টা সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে।

*(লেখক প্রাক্তন প্রধান আয়কর কমিশনার)*

# শিলচরে আর এস এসের রাষ্ট্রজাগরণ শিবির

## ধর্ষণ ঘটে ইন্ডিয়া-য়, ভারতে নয় : ভাগবত

*শিলচরে স্বয়ংসেবকদের পথ সঞ্চলন। বক্তব্য রাখছেন শ্রী মোহনরাও ভাগবত।*

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** দেশের অন্য প্রান্ত, বিশেষত উত্তর ভারতের মতো পূর্বাঞ্চলকে কখনই হাজার বছর ধরে বিদেশি শক্তির গোলামি করতে হয়নি। এই অঞ্চলের মানুষের লড়ার মানসিকতা রয়েছে। তারা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে শেখেনি। তাই উত্তর-পূর্ব অটুট থাকলে ভারতও অখণ্ড থাকবে। অসম কখনই দ্বিতীয় কাশ্মীর হয়ে উঠবে না। যদিও দেশের এই প্রান্তের সীমানা অসুরক্ষিত, সীমান্তে এক পায়ে খাড়া রয়েছে শত্রুরা, অবাধে চলছে অনুপ্রবেশ এবং অসমের রাজনীতিতে হুকুম চালানোর মতো শক্তি অর্জন করেছে অনুপ্রবেশকারীরা। গত ১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় শিলচর জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে এক নাগরিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। সভার মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন দক্ষিণ অসম প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিমল নাথচৌধুরী। উল্লেখ্য, তিনদিনব্যাপী রাষ্ট্রজাগরণ শিবিরে যোগ দিতে গত ২৮ ডিসেম্বর শিলচরে এসেছিলেন শ্রীভাগবত।

২৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে এই শিবির। শ্রী ভাগবত বলেন, হিন্দু, সে যে দেশ থেকেই হোক, যদি বিতাড়িত হয়, তার একমাত্র আশ্রয় হিন্দুস্থান। বাংলাদেশ থেকে যেসব হিন্দু পালিয়ে এসেছে তাদের পূর্ণ মর্যাদায় ভারতীয় নাগরিকত্ব দিতে হবে। বাঙালি হিন্দুদের পিঠে ডি ভোটারের তকমা লাগানো চলবে না। ভোটার তারাই যারা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে। ডি-ভোটার ইস্যুতে সঙ্ঘ ইতিমধ্যেই সুপ্রীম কোর্টে পিটিশন দায়ের করেছে। তিনি বলেন, ভারতে সব রয়েছে। লোকবল থেকে শুরু করে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। মেধার দৌড়ে ভারত সারা বিশ্বে এখনও ধারা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু তারপরও সাধারণ মানুষের সামান্য চাহিদা এ দেশে পূর্ণ হয় না। জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এর জন্য দায়ী ভ্রষ্ট রাজনীতি।

সারা বিশ্ব যখন পথ দেখানোর জন্য ভারত ও হিন্দুত্বের মুখাপেক্ষী তখন ভারতই শুধু নিজ পরম্পরা বিস্মৃত।

সভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে দিল্লীর ধর্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এমন পৈশাচিক কাজ 'ভারতে' ঘটে না, ঘটে 'ইন্ডিয়া'য়। প্রধানত পশ্চিমী সভ্যতায় প্রভাবিত শহরগুলিতেই এইসব ধর্ষণের কাণ্ড ঘটে— গ্রামীণ ভারতে নয়। ভারতের গ্রামগুলিতেও বনাঞ্চলে এরকম গণধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে না। প্রকৃত ভারতে নারী এখনও মাতৃস্বরূপা।

শ্রীভাগবত বলেন, দিল্লীর জঘন্য ধর্ষণ কাণ্ডের অপরাধীদের ফাঁসির সাজা হোক। প্রয়োজনে বর্তমান দেশের আইন বদল করে তৈরি হোক আরও কঠিন আইন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বলেন, শুধু আইন দিয়ে কিছু হবে না। দেশের মানুষকে হিন্দু সংস্কৃতির উপর আস্থা রেখে মানসিকতা পাল্টাতে হবে। তিনি বলেন, দিল্লীর ধর্ষণকাণ্ড দেখিয়ে দিয়েছে গণঅভ্যুত্থান ঘটলে সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীও ঝুঁকতে বাধ্য হয়।

# সরকারি উদাসীনতায় গুরুত্ব হারাচ্ছে মালদার পাতালচণ্ডী

**তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা॥** মালদা জেলার ঐতিহাসিক স্থান গৌড়, পাণ্ডুয়া ও আদিনার পাশাপাশি বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান ও তীর্থস্থান পাতালচণ্ডী পর্যটন মানচিত্রে স্থান করে নিলেও সরকারি উদাসীনতায় এর গুরুত্ব হারিয়ে যেতে বসেছে। মালদা শহর থেকে মাত্র ৬ কিলোমিটার দূরে ৩৪নং জাতীয় সড়ক থেকে বাম দিকে কিছুদূর গেলেই উঁচু টিলার ওপর বিশাল ঝিল দিয়ে ঘেরা এই মনোরম স্থানটি আজও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু। গৌড়ের গাইড বইতে জেলার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের সঙ্গে পাতালচণ্ডীর নামও উল্লেখ রয়েছে। এই পর্যটন কেন্দ্রটি যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটিও সরকারি অবহেলাতে পাকা হয়নি। ফলে বর্ষাকালে এই ঐতিহাসিক স্থানটিতে যাওয়া প্রচণ্ড কষ্টকর হয়ে ওঠে।

*পাতালচণ্ডী মন্দিরে লোহার শেকল (বাঁ দিকে) ও কালীমূর্তি (ডান দিকে)।*

২০১০ সালের এপ্রিল মাসে মালদা জেলা পরিষদ থেকে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে রাস্তার কাজ শুরু হলেও মাঝপথে তা বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে মালদা জেলা 'হেরিটেজ কনসালটেটিভ কমিটি (সরকারি) পাতালচণ্ডীকে (হেরিটেজ স্থান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই রিপোর্ট জেলাশাসক এবং প্রত্নতত্ত্ব আধিকারিক কলকাতাকে পাতালচণ্ডী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। রাস্তা তৈরির জনও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে জানানো হলে তারা জেলা শাসককে রাস্তা তৈরির নির্দেশ দিয়েছে। অথচ জেলা শাসক এবং প্রশাসন এখনও তা কার্যকর করেনি।

প্রচলিত কাহিনী অনুসারে সেন রাজাদের রাজত্বকালে গৌড়ে ৪টি দ্বারে চারটি চণ্ডী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার অনেক আগে থেকেই গৌড় নগরীর উত্তরদিকে পাতালচণ্ডী মন্দির ছিল। ঐতিহাসিকদের তথ্য থেকে জানা যায় গৌড়ের সেন রাজারা এই পবিত্রপীঠকেই উত্তর দিকের চণ্ডীর দ্বারে রূপান্তরিত করেন। এছাড়া বিশ শতকের প্রথমে লর্ড কার্জনের গৌড় ভ্রমণ উপলক্ষে গৌড়ের যে মানচিত্র তৈরি হয় তাতে পাতালচণ্ডী দ্বারের উল্লেখ আছে। বখতিয়ার খিলজির আক্রমণের সময় পাতালচণ্ডী মন্দিরটিও ধ্বংস হয়ে যায়।

বর্তমানে মালদা জেলার দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তেরা মাসের শনি ও মঙ্গলবার পুজো দেওয়ার জন্য সমবেত হয়। তাছাড়া বাসন্তীপূজা ও কালীপূজা এখানে ধুমধাম ও ভক্তি নিষ্ঠা সহকারে হয়ে থাকে এবং হাজার হাজার ভক্ত তাতে অংশগ্রহণ করে। উঁচু গড়ের ওপর একটি মন্দিরও রয়েছে। সেখানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত কালী মূর্তির পূজা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ, এই পাতালচণ্ডী সংলগ্ন ঝিলটি মা পাতালচণ্ডীর নামে থাকলেও এক দুষ্টচক্র তাদের কয়েকজনের নামে অবৈধভাবে রেকর্ড করিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা মাছ চাষ করে আয় করছে।

পাতালচণ্ডীকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য নতুন পর্যটন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর কাছে ইতিমধ্যে আবেদন জানানো হয়েছে। শীতকালে খারাপ রাস্তার মধ্যে দিয়েও পর্যটকরা এই পাতালচণ্ডীতে বনভোজন করতে ছুটে আসেন। কিন্তু স্থানটির দৈন্যদশা দেখে হতাশ হয়ে পড়েন। এখনও এই স্থানটিতে কালী মূর্তির পাশাপাশি এক সময়ের নদী বন্দরের সাক্ষী হিসাবে বিশাল লোহার শেকল, পাথরের ঢিপি পর্যটকদের এখানে টেনে আনে। প্রতি অমাবস্যাতে ধর্মপ্রাণ মানুষেরা তাদের সামর্থ্যমতো ভোগ প্রসাদ নিবেদন করে সবাই মিলে তা গ্রহণ করে তৃপ্তলাভ করে। নতুন পাতালচণ্ডী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে মন্দিরটি সংস্কারের জন্য তারা আগামী বছরে মানুষের দরজাতে যাবে এবং সরকারকে চাপ দেওয়ার জন্য আরও প্রচারপত্র বিলি করবে।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
পড়ুন ও পড়ান
স্বস্তিকা
প্রতি সংখ্যা মূল্য ৭.০০ টাকা
বার্ষিক সডাক গ্রাহকমূল্য ৩২৫ টাকা

# ক্ষমতার স্বার্থে জামায়াত এখন নিজেদের গঠনতন্ত্র বদলাচ্ছে

**ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি**॥ ক্ষমতা বড়, আল্লাহ নয়, রসুল নয়। ক্ষমতার স্বার্থে শেষ পর্যন্ত ইসলামি শাসন কায়েমের জন্য ‘জান কোরবান’ করার নীতিগত অবস্থান থেকে সরে এসেছে ধর্মান্ধ ও একাত্তরের ঘাতক জামায়াত-এ ইসলামি। দলের গোড়াপত্তন থেকে আল্লাহতালাহ প্রদত্ত ও রসুল হযরত মোহাম্মদ প্রদর্শিত ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের যে অঙ্গীকার গঠনতন্ত্রে মূল নীতি হিসেবে সন্নিবেশিত ছিল তা বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক অর্থাৎ জনগণের শাসনব্যবস্থায় আস্থা রাখলো জামায়াত। জামায়াতে ইসলামির গঠনতন্ত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিপন্থী এবং দেশের সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এ কারণে এই ইসলামি দলের নিবন্ধন বাতিল হতে পারে— নির্বাচন কমিশন এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে পরিবর্তনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার পর বৈধ রাজনীতির পথ থেকে সরে যেতে হতে পারে, এই আশংকায় জামায়াতের বর্তমান নেতৃত্ব তড়িঘড়ি গঠনতন্ত্র সংশোধন করে নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়েছে। এখন গঠনতন্ত্রে নীতিগত অবস্থান পরিবর্তনের দিকগুলো খতিয়ে দেখছে নির্বাচন কমিশন। পরিবর্তন ইতিবাচক হলে এবং গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতি আস্থা অন্তত লিখিতভাবে হলেও প্রমাণিত হলে জামায়াতের নিবন্ধন বহাল থাকবে। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াতের সাত শীর্ষ নেতার বিচার চলছে, শিগগিরই অন্তত একজনের মামলায় (নায়েবে আমির দেলোয়ার হোসেন সাঈদি) রায় হবার কথা রয়েছে। এ বিচার বন্ধের দাবিতে দেশজুড়ে হামলা চলছে জামায়াতের নেতাকর্মীদের। প্রধান বিরোধী দল বিএনপির সঙ্গে মিলে হরতাল ডাকছে সারাদেশে, এই হরতালে ইতিমধ্যে পাঁচশোর ওপর বাড়ি পুড়েছে। ভাঙচুর হয়েছে। প্রাণ গেছে কয়েকজনের। এসব কারণে সারাদেশে জামায়াতবিরোধী মনোভাব এখন তুঙ্গে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পাশাপাশি জামায়াত-এ ইসলামিকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি উঠেছে। ‘জামায়াত-এ ইসলামি আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধানদাতা ও আইনপ্রণেতা মানিয়া লইবে না এবং আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁহার দেওয়া আইন পালনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় এমন সকল আনুগত্য মানিয়া লইতে অস্বীকার

করিবে’— জামায়াতের সংশোধিত গঠনতন্ত্রে এই মূল নীতিটি বাদ পড়েছে, আস্থা স্থাপিত হয়েছে ‘গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা’র প্রতি। বলা হয়েছে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা। গঠনতন্ত্রের একটি ধারায় বলা হয়েছিল, ‘সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের সুবিচারপূর্ণ শাসন কায়েম করিয়া সমাজ হইতে সকল প্রকার জুলুম, শোষণ, দুর্নীতি ও অবিচারের অবসান ঘটাইবার আহ্বান জানাইবে’। এখানে ‘ইসলামের’ শব্দটি বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে ‘গণতান্ত্রিক পদ্ধতি’ কথাটি সংযোজিত হয়েছে। আর একটি ধারায় বলা হয়েছিল, ‘ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠাকল্পে গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বঞ্চিত সংশোধন আনয়নের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা হইবে।’ এই বাক্য থেকে ‘খোদাভীরু’ বাদ দিয়ে ‘চরিত্রবান’ শব্দটি যোগ করা হয়েছে। গঠনতন্ত্রে একটি ধারায় ‘জামায়াতের সদস্য হতে হলে ইসলামে বিশ্বাস ও শরিয়তের নির্ধারিত ফরজ ও ওয়াজির আদায়ের’ শর্ত দেওয়া হয়েছিল। এই ধারাটি সংশোধিত গঠনতন্ত্রে বিলুপ্ত করা হয়েছে। আর একটি ধারায় যে কোনও অমুসলিম নাগরিক কয়েকটি শর্ত পূরণের মাধ্যমে জামায়াতের সদস্য হতে পারবে বলা হয়েছিল। জামায়াত সংশোধিত গঠনতন্ত্রে এই ধারাটিও বাদ দিয়েছে। একটি ধারায় ছিল, ‘আমিরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যকে (রুকনকে) কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন।’ এটিও সংবিধান ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের পরিপন্থী বিধায় বিলুপ্ত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন আইনে নিবন্ধিত সব দলকে তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত সকল স্তরে অন্যূন ৩৩ শতাংশ মহিলা অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জামায়াত পর্যায়ক্রমে এই ধারা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে।

মোদ্দা কথা, বাংলাদেশের জামায়াত দলের নতুন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আল্লাহভীরু দল নয়, ‘আল্লাহর আইন ছাড়া মানুষের তৈরি আইন মানি না’ এই নীতিগত অবস্থানও বিসর্জন দিয়েছে জামায়াত। এখন মানুষের তৈরি আইনের কাছেই নতি স্বীকার করছে। আবুল আলা মওদুদি প্রতিষ্ঠিত দলটির গোড়া থেকে ‘আদর্শগত’ বক্তব্য ছিল, নারী নেতৃত্ব হারাম। ইসলাম নারী নেতৃত্ব অনুমোদন করেনি। কিন্তু বাংলাদেশের জামায়াতিরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদার হাত ধরেছে। খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব মেনেই ক্ষমতায় গেছে, যুদ্ধাপরাধী দুই জামায়াত নেতা খালেদার মন্ত্রিসভায় সদস্যও হয়েছেন।

ক্ষমতার স্বার্থে জঙ্গীদের মূল সংগঠন জামায়াত কি পারে না তাই এখন দেখার।

# ইতিহাসের দলিল, নরিন্দরের মিনি মিউজিয়াম

অ দ রকম

**বিরাজ রায়॥** একচল্লিশ বছর বয়সি পাঞ্জাবের নরিন্দর সিংহ; ছোটবেলা থেকেই কয়েন (মুদ্রা) সংগ্রহের নেশা। ঠাকুর্দার কাছ থেকে পাওয়া ১৯১১টি রূপোর মুদ্রা আগ্রহটাকে আরও বাড়িয়ে দিল। তারপর বয়স যত বেড়েছে সংগ্রহের তালিকাও তত বড়ো হয়েছে। আর তাই দিয়েই লুধিয়ানার বাড়িতেই তৈরি করে ফেলেছেন একটি সংগ্রহশালা। শিখ পরিবারের এই ছোট্ট বাড়িটির

*নিজের সংগ্রহশালায় নরিন্দর সিংহ (উপরে)। নরিন্দরের সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র (নীচে)।*

একতলায় ঢুকলেই গন্ধ পাওয়া যায় পুরনো শিখ ইতিহাসের। মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের ময়ূর ছাপের মুদ্রা থেকে গুরু গোবিন্দ সিংহের তরোয়াল বা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, কি নেই সেখানে? মাত্র তেরো বছর বয়স থেকে তিনি যা সংগ্রহ করেছেন তাতে খঞ্জ, ছুরির মতো পঞ্চাশ রকমের অস্ত্র রয়েছে। যেগুলো প্রায় চারশো বছরের পুরোনো। শ'খানেক রয়েছে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি। বিভিন্ন দেশে একসময় প্রচলিত ছিল এখন আশি হাজারেরও বেশি মুদ্রা। যার মধ্যে পাঁচ হাজার 'নানকশাহী'। এগুলি ১৭৬৫ থেকে ১৮৪৯ মধ্যে শিখ রাজত্বকালে প্রচলিত ছিল।

সংগ্রহশালায় যত্নের সঙ্গে রাখা প্রত্যেকটি জিনিসের পিছনেই জড়িয়ে আছে নানা কাহিনী। রঞ্জিৎ সিংহ ১৮০৫ সাল নাগাদ রাণী মোরান-এর স্মরণে ময়ূর খচিত তামার মুদ্রা চালু করেন। রাণী মোরান প্রথম জীবনে একজন বাইজী ছিলেন। রাজা সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁর নৃত্যের ভঙ্গিমা ময়ূরের মতো ছিল বলে মুদ্রাতে ময়ূরের ছাপ দেওয়া হয়। তবে রাজা নিজের নামে বা অন্য কোনও রাণীর নামে কোনও মুদ্রা চালু করেননি। এছাড়াও ওঁ-কার ত্রিশূল বা শ্রীরামচন্দ্রের ছাপ দেওয়া মুদ্রাও রয়েছে। সংগ্রহশালার অস্ত্রগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে গোবিন্দ সিংহের ব্যবহৃত তরোয়াল, যা দিয়ে তিনি মোঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। 'অধ্যাত্ম প্রকাশ গ্রন্থ' নামে একটি পাণ্ডুলিপি আছে, যেটির রচনাকাল ১৬৬৮ খৃস্টাব্দে। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ থেকে গুরুমুখী ভাষায় অনূদিত রামায়ণ। ১৮২৯ সালে রচিত চোদ্দশো পাতার এই গ্রন্থের প্রচ্ছদে বিয়াল্লিশ টাকা দামও উল্লিখিত আছে।

কিন্তু এতো সব দুষ্প্রাপ্য জিনিস তিনি কীভাবে সংগ্রহ করলেন? সহজ উত্তর নরিন্দরের— আমি ফাঁক পেলেই এখানে আসা দর্শনার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। তাঁদের মধ্যেই অনেকে এগুলি 'দান' করেছেন বা বিক্রি করেছেন। ১৯৯৫ সালে অমৃতসরে তিনি একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। দেখতে আসা অনেক ব্যক্তিই তাঁর হাতে 'নানকশাহী' মুদ্রা তুলে দিয়েছেন। নিজের কোনও কাজে লাগছে না বলে এক বৃদ্ধ মহিলা ভগত কবির দাসের একটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহশালায় দিয়ে গেছেন। গুরুমুখী রামায়ণটি তিনি পেয়েছেন হোসিয়ারপুরের এক পরিবার কাছ থেকে। আর রাণী মোরানের মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করেছেন অমৃতসরের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। এভাবেই নরিন্দর সিংহের একক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে লুধিয়ানার শিখ সংগ্রহশালা। তিনি চান তাঁর এই মিউজিয়াম শিখ ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করুক।

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
Chicken Masala
DUTA
Sabji Mix
Kashmiri MIRCH POWDER
SUPER Cumin Powder
SUPER Turmeric Powder
Chilli Powder
SUPER Coriander Powder
BLACK Pepper powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

## মুদ্রার প্রকারভেদ

# কোন্ মুদ্রা কিভাবে করতে হবে এবং এর ফল

আশীষ মণ্ডল

জ্ঞান মুদ্রা

**জ্ঞান মুদ্রা (Meditation Mudra) বা ধ্যান মুদ্রা :**

অঙ্গুষ্ঠা এবং তর্জনী পরস্পর স্পর্শ করতে হবে। বাকী তিন অঙ্গুলী সোজা। এই মুদ্রাকে জ্ঞানমুদ্রা বলা হয়। অনেকে ধ্যানমুদ্রা, শিরোমণি মুদ্রাও বলে। এই মুদ্রাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন।

**উপকারিতা :**

- আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।
- স্মরণশক্তি তীব্র হয়।
- মানসিক উদ্বেগ ও চঞ্চলতা দূর হয়।
- স্নায়ু সবল হয়।
- মন প্রফুল্ল হয়।
- এছাড়া অনিদ্রা রোগ দূর হয়।

বায়ু মুদ্রা

**বায়ু মুদ্রা (Air Mudra) :**

তর্জনী আঙ্গুল মুড়ে অঙ্গুষ্ঠার মূলে লাগিয়ে বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা চাপ দিতে হবে, তিন আঙ্গুল সোজা রাখতে হবে। অন্ততঃ ১০-১৫ মিনিট ধরে করতে হবে।

**উপকারিতা :** এই মুদ্রায় যে কোনও বাত রোগ ভাল হয়। বিশেষ ভাবে সন্ধিবাত, গেঁটে বাত, আর্থারাইটিস, কম্পবাত, পক্ষাঘাত, হাঁটুর যন্ত্রণা, সাইটিকা এবং গ্যাস জাতীয় রোগ দূর হয়। ঘাড় ও মেরুদণ্ডের যন্ত্রণাতে বিশেষ করে এই মুদ্রা ফলদায়ী।

আকাশ মুদ্রা

**আকাশ মুদ্রা (Space Mudra) :**

মধ্যমা অর্থাৎ মাঝের আঙ্গুলের অগ্রভাগের সঙ্গে বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ মিলিত বা স্পর্শ করলে আকাশ মুদ্রা হবে। অন্য তিন আঙ্গুল সোজা থাকবে।

**উপকারিতা :** যে কোনও রোগ যেমন কানের যন্ত্রণা, কানে কম শোনা, বধিরতা এছাড়া মাথাঘোরা, থাইরয়েডজনিত রোগ, গলার রোগ দূর হয়, হৃদয়ের রোগ ঠিক হয়, মাড়ি বজবুত হয়।

শূন্য মুদ্রা

**শূন্য মুদ্রা (Sky Mudra) :**

মধ্যমা অর্থাৎ মাঝের অঙ্গুলি মুড়ে অঙ্গুষ্ঠার মূলে লাগিয়ে বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা হাল্কা চাপ দিলে শূন্য মুদ্রা হবে। অন্য তিন আঙ্গুল সোজা থাকবে।

**উপকারিতা :** দেহস্থিত আকাশ তত্ত্ব যদি বৃদ্ধি হয়, তাহলে এই মুদ্রা করলে উপকার হবে। প্রতিদিন ৩০-৪৫ মিনিট এই মুদ্রা করলে কানের যন্ত্রণা হওয়া, কানে শুনতে না পাওয়া এবং কানে কম শোনা ইত্যাদি রোগ দূর হয়। এছাড়া অস্থির দুর্বলতা এবং হৃদয় রোগ, মাড়ি মজবুত এবং গলার রোগ এবং থাইরয়েড রোগেও লাভ পাওয়া যায়। **বিঃ দ্রঃ :** ভোজন করার সময় এবং হাঁটতে হাঁটতে এই মুদ্রা করতে যাবেন না তাহলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পৃথিবী মুদ্রা

**পৃথিবী মুদ্রা (Earth Mudra) :**

অনামিকা অর্থাৎ অঙ্গুরীয় আঙ্গুলের ডগার সঙ্গে বুড়ো আঙ্গুলের ডগা স্পর্শ করলে পৃথিবী মুদ্রা হবে। অন্য তিন আঙ্গুল সোজা থাকবে।

**উপকারিতা :** এই মুদ্রা নিয়মিত অভ্যাস করলে শারীরিক দুর্বলতা, শরীরের ও জনের স্বল্পতা এবং মোটা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি রোগ সারে। পাচন শক্তি ঠিক করে। জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়। শরীরের ভিটামিন অভাবকে দূর করে, শরীরে স্ফুর্তি, ক্লান্তি এবং তেজস্বিতা আসে। সাধকদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।

*(ক্রমশঃ)*

# চা-বাগানে রাম-রামায়ণ-রামশিলা

**মালবাজার থেকে বাসুদেব পাল॥** ‘‘আমাদেরকে ‘আদিবাসী’ বলে মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস চলছে। চেষ্টা চলছে, যাতে আমরা আমাদের মূল ধর্ম-সংস্কৃতি-পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হীনমন্যতায় ভুগি এবং ধর্মান্তরকরণের শিকার হই।’’

উপরোক্ত বক্তব্য ডুয়ার্সের চা-বাগান এলাকায় ‘‘সাদরী জনকল্যাণ সমিতির’’-র প্রতিষ্ঠাতা সন্তলাল নায়ক-এর। তিনি গত ২৩ ডিসেম্বর ডুয়ার্সের মালবাজার-এর কাছে ইনডং চা-বাগান হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত হিন্দু সম্মেলনে বক্তব্য রাখছিলেন। প্রসঙ্গত, ইংরেজ শাসকদের যোজনায় একদা বিহারের ছোটনাগপুর, রাঁচী (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) ও নেপাল থেকে ব্যাপক সংখ্যায় জনজাতিদেরকে নিয়ে আসা হয়েছিল চা-বাগানে শ্রমিকের কাজ করিয়ে ইংরেজদের রাজকোষ বৃদ্ধি করার স্বার্থে। সেই থেকে তাঁরা নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি পরম্পরার মূল স্রোত থেকে দূরে থাকলেও তাকে সসম্মানে বাঁচিয়ে (কিছু অপবাদ বাদ দিলে) রেখেছেন। পারস্পরিক পৃথক ভাষার অসুবিধা দূর করতে সময়ের প্রয়োজনে কালের প্রবাহে তৈরি হয়েছে ‘‘সাদরী’’ নামে এক মিশ্র ভাষা। সেখানে বাঙালী, নেপালী ও বিহারবাসীদের ভোজপুরী বা দেহাতি হিন্দীর মিশ্রণ ঘটেছে। রাম, রামায়ণ আর সবশেষে একবিংশ শতাব্দীতে রামশিলা বাঁচিয়ে রেখেছে হিন্দুত্ব, বাঁচিয়ে রেখেছে হিন্দু সংস্কৃতি ও পরম্পরা। এরকমই দৃশ্য দেখা গেল কয়েকদিন আগে ডুয়ার্সের অসমতল পাহাড়ী এলাকায়— ইনডং চা বাগানের হাইস্কুল ময়দানে। সহস্রাধিক আবালবৃদ্ধবণিতা একত্রিত হয়েছেন। উপলক্ষ্য— স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বলিদান দিবস (২৩ ডিসেম্বর) উদ্‌যাপন। হিন্দু সম্মেলন, বৈদিক শান্তি যজ্ঞ, পরাবর্তন (খৃস্টান থেকে স্বধর্মে পুনরাগমন) এবং সর্বোপরি জলে ভাসমান রামশিলা দর্শন। উদ্যোক্তা ধর্মরক্ষা সমিতি, উত্তরবঙ্গ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগ, উত্তরবঙ্গ।

শীতের সকালে কনকনে ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে যথারীতি স্নান করে শুধুমাত্র লালপাড় সাদা শাড়ী পরে মা-বোনেদের কলস ভর্তি জল কাঁখে নিয়ে কলসযাত্রা। কোনও বাহুল্য নেই শীতবস্ত্রের। যাত্রায় সব বয়সের মা-বোনেরা সম্মিলিত— তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কিছু কচিকাঁচা বালিকারাও। কোনওরকমে শাড়িটা গায়ে জড়িয়েছে, অনভ্যস্ত, এখনও শাড়ি পরার বয়স হয়নি, তবে উৎসাহে কোনও ঘাটতি নেই। শিলিগুড়ি থেকে সকালে রওনা হয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব-ক্ষেত্রকার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার এবং অন্য কয়েকজন যখন ইনডং

*শ্রদ্ধানন্দ বলিদান দিবসে ডুয়ার্সের ইনডং চা-বাগানের স্কুল ময়দানে সহস্রাধিক মানুষের রামশিলা দর্শন।*

চা বাগান-এ পৌঁছালেন তখন বেলা হয়ে গেছে। কিন্তু অভ্যর্থনার কমতি নেই। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি এবং পুষ্পবৃষ্টি করে শান্তিজল দিয়ে স্বাগত করল একদল লালপাড় সাদা শাড়ি পরিহিতা মেয়েরা।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন 'সাদরী' ধর্মগুরু সন্তলাল নায়ক। সকলে চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতে গলা মেলালেন। তখন ঘড়ির কাঁটা বারোটা পার। এরপর একদিকে বৈদিক শান্তি যজ্ঞ শুরু করলেন আর্য সমাজের রাজেশ শাস্ত্রী। অন্যদিকে একটা চৌবাচ্চা কেটে চারপাশে রীতিমতো সাজানো হয়েছে। সেখানেই সবাই কলস যাত্রার পর ক্ষুদ্র কলসের পবিত্র জল ঢালছেন। রামশিলা মাথায় নিয়ে চললেন চন্দ্রপতি চিকবরাইক। মা-বোনেরা সেই দৃশ্য দেখতে ভেঙে পড়েছে বললে কম বলা হবে। তারপর সেই চৌবাচ্চায় তা ভাসানো হলো। চারদিক থেকে মা-বোনেরা ওই জল একটু মাথায় নিতে, ছোট ছোট ছেলে মেয়ের মাথায় ছিটিয়ে দিতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। শোভা ওঁরাও, বিদ্যা চিকবরাইকরা ভিড় সামাল দিতে পারছে না। সবাই রামভক্তিতে উৎফুল্ল, ওতপ্রোত, একাকার। কত না প্রশান্তি চোখে মুখে। চন্দ্রপতিবাবুর ৯১ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ বাবাও এসেছেন। তিনিই বয়স্কতম এবং এলাকায় এক প্রমুখ ধর্মগুরু— মংলু ভগত নামে সুপরিচিত। আশা মিটিয়ে ভাসমান রামশিলা দর্শনের পর ধর্মসভায় সকলে সমবেত হলেন। একে একে বক্তব্য রাখলেন আর্য সমাজ থেকে আগত বসুমিত্রজী মহারাজ, সরস্বতী দেবী ছেত্রী, কবীরপন্থী সন্ত গণেশ দাসজী, সারদা সমাজের গণেশ হাঁসদা (সাদরী ভাষায়) ও গঙ্গাপ্রসাদ মুর্মু প্রমুখ। মাঝে মাঝে জনজাতি নৃত্য ও ভোজপুরী ভাষায় ভগবান রামের জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত লোকসঙ্গীত এবং ভজন। সব মিলিয়ে উৎসবের আমেজ, বিভিন্ন বাগান থেকে ছোট ছোট ট্রাকে সবাই আসছেন। উদ্যোক্তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল— এদিন চল্লিশটি জনজাতি খৃস্টান পরিবারের সবাই শুদ্ধিযজ্ঞের মাধ্যমে স্বধর্মে ফিরে এসেছেন। অনুষ্ঠানের রেশ থেকে গেল। সন্ধ্যার পর সবাই ফিরে চলল।

*শঙ্খধ্বনি ইত্যাদির মাধ্যমে সত্যনারায়ণ মজুমদারকে স্বাগত জানাচ্ছেন মহিলারা।*

# 'রবীন্দ্রনাথ ও বৈদিক উত্তরাধিকার' বিষয়ে সর্বভারতীয় আলোচনা সভা

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** গত ২৭-২৮ ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হলো 'রবীন্দ্রনাথ ও বৈদিক উত্তরাধিকার' বিষয়ে ন্যাশনাল সেমিনার। আয়োজক ছিলেন শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদ ও তিরুপতির শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শ্রীমতী আল্পনা সেনগুপ্তের সংস্কৃত সঙ্গীত পরিবেশটিকে ভাবগম্ভীর করে তোলে। রবীন্দ্রসৃষ্টির মূল প্রেরণা যে উপনিষদ বিভিন্ন বক্তা বিষয়টিকে নানাভাবে তুলে ধরেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. করুণাসিন্ধু দাস প্রথম দিন মূল বক্তব্য রাখেন ও বিভিন্ন আলোচনার সূত্রপাত করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বেদান্তের বিশিষ্ট গবেষক ড. সমীরণ চন্দ্র চক্রবর্তী অসাধারণ বাক্‌মাধুর্যে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ড. শিবনাথ শর্মা উপনিষদ কীভাবে রবীন্দ্রনাথকে সমৃদ্ধ করেছিল তা তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথ ও ভগবদ্গীতা বিষয়ে অধ্যাপক ড. নরনারায়ণ মুখার্জী, ড. তারকনাথ চক্রবর্তী মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। প্রথমদিন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অধ্যাপক ড. নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় দিন রবীন্দ্রনাথ ও ধ্রুপদী সাহিত্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এছাড়া বিভিন্ন বক্তা রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ভাবধারা থেকে কীভাবে সমৃদ্ধ হয়েছেন তা তুলে ধরেন। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার এই আলোচনা সভাটিতে উপস্থিতির হার যথেষ্ট কম বলে মনে হয়েছে।

## মঙ্গলনিধি

মালদা জেলার কালিয়াচক বালিয়াডাঙ্গার স্বয়ংসেবক এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অখিল ঋষির মেয়ে অরিহার 'মুখে ভাত' উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে ১৫০১ টাকা সমাজ সেবা মূলক কাজের জন্য অর্পণ করেন মহকুমা কার্যবাহ পবিত্র কুমার গুপ্তের হাতে। গত ২৮ ডিসেম্বর এই অনুষ্ঠান হয়।

***

মালদা জেলার গাজোল শাখার স্বয়ংসেবক সুমন বর্মণের শুভ বিবাহ উপলক্ষে ১০০১ টাকা সমাজ সেবা কাজের জন্য জেলা প্রচারক মলয় সরকারের হাতে অর্পণ করেন।

## শোকসংবাদ

গত ২৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার নগর কার্যবাহ সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ভবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। পাঁচ পুত্র ও এক কন্যাকে তিনি রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে ৯৮ বছর বয়স হয়েছিল।

# নাগপুরে উদযাপিত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

**জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।।** নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৮৫তম আসরটি এবার বসেছিল মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরে। সারা দেশ থেকে সব আঞ্চলিক ও প্রান্তীয় শাখা মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এই আসরে হাজির ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সার্ধশতজন্মবার্ষিকীর সাপেক্ষে এবারের এই সাংস্কৃতিক মহাকুম্ভটি সব অর্থেই এই দুই মহামনীষীর স্মৃতিচারণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। কলকাতার সর্বজনপ্রিয় তাত্ত্বিক সন্ন্যাসী স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ও মণিপুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দ মহারাজ বিবেকানন্দের জীবন ও কর্মের নানা দিক নিয়ে মনোজ্ঞ কথকতা করেন। আর সম্মেলন-রত্ন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সুনীলময় ঘোষ কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস ও বিজেপির দুই প্রতিনিধি সাংসদ বিলাস রাও মূর্তি ও বিধায়ক সুধাকর দেশমুখ। দুই রাজনীতিকই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ দেন বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের। এ ধরনের অনুষ্ঠান যত হবে তত সমাজ সভ্যতার পুষ্টিবিধান হবে বলে মত প্রকাশ করেন তাঁরা। আর বাংলা ও মারাঠা সংস্কৃতির মধ্যে যে নিবিড় মেলবন্ধন আছে তা আরও সুদৃঢ় করার ওপর জোর দেন দুজনেই। অন্যদিকে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ বলেন, বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন সব অর্থেই এক সর্বভারতীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। তাঁর কথার প্রতিফলিত রূপ এবার দেখা গেল। চারদিনের এই আসরে প্রতিদিনই মারাঠা শিল্প ও সাহিত্যের অনুপম প্রকাশ সম্মেলনকে বিশেষ মাত্রা প্রদান করেছে।

সাহিত্য-নির্ভর চলচ্চিত্র ও নাটক নিয়ে আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়, জর্জ বেকার এবং প্রেমেন্দ্র মজুমদার। সদ্যপ্রয়াত বাঙালির প্রাণের লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৈয়দ মুজতবা সিরাজের সাহিত্যকীর্তি নিয়ে বলেন দুই জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। আর নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য জীবনের পর্বান্তর ও পথ পরিক্রমার দিক চিহ্নগুলি তুলে ধরেন। সাহিত্যচর্চা, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, আলোচনাচক্র ছাড়াও প্রাত্যহিক সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক বিচিত্রাও যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছে। সঙ্গীত, নৃত্য পরিবেশন, গীতি ও নৃত্যনাট্য পরিবেশনায় মুন্সিয়ানার ছাপ রেখেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শাখা আর ভিনপ্রদেশের এলাহাবাদ, নাগপুর, বেঙ্গালুরু শাখার শিল্পীরা। সমস্ত প্রতিনিধিকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল আর এস এসের তিনটি ভবনে। আর সাহিত্য-সংস্কৃতির সব অনুষ্ঠান হয়েছে বালসদন সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সে। একই সঙ্গে আহার-ভোজনও।

*অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের ত্রয়োদশতম অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে বিশিষ্টজনেরা। এ বি এ পি-র এই সম্মেলন গত ২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরে হয়ে গেল। এই সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল— 'ভাইটালাইজিং কনস্টিটিউশনাল অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশন।' সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এ কে পট্টনায়ক ও সুপ্রীম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রবীণ অ্যাডভোকেট এম এন কৃষ্ণমানাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।*

খেলা

# ভারতের অন্যতম সেরা অলিম্পিয়ান লেসলি ক্লডিয়াস

**জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

না, তিনি লেসলি ক্লডিয়াস হয়েও ভারতরত্ন খেতাব পাননি। তাঁকে রাজ্যসরকার কোনও জমি বা ফ্ল্যাট দেয়নি। দেওয়ার কথা তাদের মাথায়ও আসেনি। জীবনের শেষপ্রান্তে আসার পর মমতা-সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী তাঁর দফতর থেকে চিকিৎসা বাবদ ক্লাডিয়াসের হাতে একলক্ষ টাকা তুলে দিয়ে এসেছেন হাসপাতালে। ব্যস ওইটুকুই। তবে তৃণমূল সরকার তাঁকে অবশ্য বঙ্গবিভূষণ খেতাব দিয়েছে, যথোচিত সংবর্ধনাও দিয়েছে। পূর্বতন বাম সরকার তাঁকে একপ্রকার ভুলেই ছিল। তাদের কৃপাধন্য যে সৌরভ গাঙ্গুলি! কতবার যে সৌরভের সম্বর্ধনা হয়েছে সেই সরকারের এক মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের উদ্যোগে তা মনে পড়লে যে কোনও পাগলও হাসবে। আর তিনি সৌরভের থেকে কয়েক হাজার মাইল উঁচুতে অবস্থান করেও চিরবঞ্চিত। তবে খৃস্টধর্মের অধীশ্বর তাঁকে কিন্তু ঠিক খুঁজে নিয়েছিলেন। ১৯৬০-এর রোম অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক ছিলেন তিনি, লেসলি ক্লডিয়াস। এর আগে তিন তিনটি অলিম্পিয়াডে সোনাজয়ী জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সেন্টার হাফ। বিশ্ব হকি দরবারে ইতিমধ্যেই কিংবদন্তী। স্বভাবতই তাঁকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন তদানীন্তন পোপ। ভ্যাটিকান প্রাসাদে ডেকে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। পরে মাঠেও এসেছিলেন খেলা দেখতে শুধু তাঁরই টানে। এর মধ্যে অবশ্য নিন্দুকেরা অন্য গন্ধ খুঁজে পান। কিন্তু সত্যই পোপ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান খৃস্টান বলে তাঁকে ডেকে আনেননি। তাঁর খেলার সৌরভে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই কাজটি করেছিলেন। একথা রোম অলিম্পিক বুলেটিনে স্বীকারও করেছিলেন

পোপ স্বয়ং। আর এবছর লন্ডন অলিম্পিক গেমস কর্তৃপক্ষ তার নামে টিউব স্টেশনের নামকরণ করেছে গেমসের ঠিক আগে। হকি স্টেডিয়ামে একটি ব্লকও রাখা হয়েছে তাঁর নামে। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে এসব দেখেও আবেগ মথিত হননি ৮৮ বছরের বৃদ্ধ আর মনে মনে ভেবেছেন স্বদেশ তাঁকে স্বীকৃতি না দিলে কি হবে, যে সাম্রাজ্যে একদা সূর্য অস্ত যেত না বলে মনে করা হোত, সেই বৃটিশ অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ তাঁকে কত বড় সম্মান, স্বীকৃতি দিয়ে বসাল বিশ্বের সর্বোচ্চ মঞ্চে, সর্ববৃহৎ উৎসবের প্রেক্ষিতে। ২১ ডিসেম্বর মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে, চারিদিকে এই গুজবের মধ্যে অনিবার্য সত্যটা হলো ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা অলিম্পিয়ান লেসলি ক্লডিয়াস ধরাধাম থেকে বিদায় নিলেন। লিয়েন্ডার পেজ একধাপ এগিয়ে তাঁকে সব সেরা অলিম্পিয়ান বলে দিয়েছেন দ্বিধাহীনচিত্তে। তবে সেরা না হলেও ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং, কেডি সিং বাবুর সঙ্গে একাসনেই বসবেন এই চার পদকজয়ী অলিম্পিয়ান। সব দিক থেকেই সন্ন্যাসীতুল্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন ক্লডিয়াস। কোনওদিন তাঁকে স্পর্শ করেনি নাম, যশ, অর্থপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। ক্যালকাটা কাস্টমসে বড় পদে থেকেই অবসর নিয়েছেন। অর্থ কষ্ট হয়ত ছিল না। কিন্তু অর্থের লোভে দেশ ছাড়েননি। অস্ট্রেলিয়া সরকার তাঁর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু দেশ ও দেশীয় হকির সেবা করাকেই জীবনের বেদমন্ত্র মনে করেছেন। বিদেশে গিয়ে বিশাল সম্মান, অর্থ কম পাওয়াকে চরিত্রবিরোধী কাজ মনে করে কোনওদিন নিজের আদর্শ মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর বড় ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন। দুই ছেলে কলকাতায় থাকেন। আর বাপ-কা-বেটা হবার সম্ভাবনা জাগিয়ে অকালে ঝরে গেছেন অপর সন্তান ববি ক্লডিয়াস। ১৯৭৮-এ আর্জেন্টিনায় বিশ্বকাপ খেলে আসার পর কলকাতায় বাইক দুর্ঘটনায় পড়ে মারা যান ববি। বিশেষজ্ঞরা তার মধ্যে লেসলির ছায়া দেখেছিলেন। ববির সমাধির ঠিক ওপরেই লেসলির সমাধিক্ষেত্র করা হয়েছে। ঠিক ৩৪ বছর পর পিতা-পুত্রের দেখা হয়ে গেল জীবনালোকের ওপারে।

বছরের শেষলগ্নে এসে ভারতবর্ষ হারালো তার দুই মহামূল্যবান রত্ন পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও লেসলি ক্লডিয়াসকে। একজন ভারতরত্ন ও তিনবার বিশ্ব সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড জয়ী। অপরজন শুধুমাত্র পদ্মশ্রী, কিন্তু তিনি তিনটি অলিম্পিয়ান সোনা ও একটি ব্রোঞ্জজয়ী। যে পদকের গুরুত্ব নোবেল, অস্কার, গ্র্যামির থেকেও বেশি। অবশ্য জনৈক বাঁটপারের সৌজন্যে এই পদকগুলিও তাঁর বাড়ি থেকে চুরি হয়ে গেছে। আর তার জন্যও এই 'সন্ন্যাসীর' কোনও হেলদোল নেই। তবে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থা তাঁকে রেপ্লিকা পদকগুলি পাঠিয়ে দিয়েছে। আসলে জীবনে সবক্ষেত্রে যিনি নির্বিকার থেকে গেছেন বরাবর, তাঁর কাছে অলিম্পিক পদকের পারমার্থিক মূল্যও যে গুরুত্বহীন।

**শব্দরূপ-৬৫৩** ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ১ | | | ২ | ■ | ৩ |
| ৪ | ৫ | | ■ | ■ | | ■ | |
| ■ | | ■ | ৬ | ■ | ৭ | ৮ | |
| ■ | ৯ | | | ■ | ■ | | ■ |
| ■ | | ■ | ■ | ১০ | | | ■ |
| ১১ | | ১২ | ■ | | ■ | | ■ |
| | ■ | | ■ | ■ | ১৩ | | |
| | ■ | ১৪ | | | | ■ | ■ |

## সূত্র :

**পাশাপাশি :** ১. বোকা-সোকা, ৪. এক প্রকার গুহ্য সাধনার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক; সহজিয়া কর্তাভজা, ৭. মগধ রাজ্যের অধিপতি বিম্বিসার ও বুদ্ধের ব্যক্তিগত চিকিৎসক; আত্রেয়-এর সেরা শিষ্য, ৯. লতাগৃহ, তরুলতাবেষ্টিত স্থান, ১০. মথুরার নিকটস্থ গ্রাম; কৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি, ১১. জল, ১৩. দু'মুখো সোনা, ১৪. যে পাপযোগে জন্ম হলে জাতক পিতৃহীন হয়।

**উপর-নীচ :** ১. নৌকার কর্ণ, যে কাষ্ঠযন্ত্র দ্বারা নৌকা ঘুরানো যায়, ২. সাধু সন্ন্যাসী; পুত্র স্থানীয়ের উপাধি, ৩. বিরাট রাজার শ্যালক, ৫. বেদের ব্রাহ্মণভাগের শেষ অংশ বা জ্ঞানকাণ্ড, বেদান্ত, ৬. খোঁড়া, ৮. বঙ্গের প্রাচীন রাজা যিনি কৌলিন্যপ্রথার প্রবর্তন করেছিলেন, ১০. বিখ্যাত রবীন্দ্র-উপন্যাস, ১১. শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী, ১২. কখনই; কোনও এককালে, ১৩. সোনা ঘষে পরীক্ষা করবার পাথর, নিকষ।

**সমাধান**
**শব্দরূপ-৬৫০**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শ | স্ব | র | ■ | ■ | বা | ম | ন |
| মি | ■ | ত | ক্ষ | শী | লা | ■ | ট |
| তা | রা | ■ | ণে | ■ | ■ | ■ | রা |
| ■ | ঘ | ট | ক | ■ | ■ | অ | জ |
| শি | ব | ■ | ■ | ম | র | ম | ■ |
| শু | ■ | ■ | ■ | ধু | ■ | ল | ব |
| পা | ■ | মা | ল | প | ত্র | ■ | লি |
| ল | লি | তা | ■ | ■ | পা | পি | ষ্ঠ |

**সঠিক উত্তরদাতা**
**শৌনক রায়চৌধুরী**
**কলকাতা-৯**

*শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।*

▯ ৬৫৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সংখ্যায়


## ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে "চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি"—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক—রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আজ রীণা দেবী। *উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।*

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

## ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা– (সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

# ।। চিত্রকথা ।। মহাভারত ।। ২৫

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

## “সেদিন আমরা একত্র হইনি—আজও নয়”

কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।

*[ কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—‘স্বামী শ্রদ্ধানন্দ’ প্রবন্ধ—মাঘ ১৩৩৩ ]*

**সৌজন্য : আশিস কুমার মঙ্গল**

**৩৩, গোরাচাঁদ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০৬**

## যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি—বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

প্রকাশিত হবে ২৮ জানুয়ারি ২০১৩

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৮ জানুয়ারি ২০১৩

# বিবেকানন্দ যুব শিবির সংখ্যা

২০১৩ সালের ১১, ১২, ও ১৩ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশত বর্ষ উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে নদীয়ার কল্যাণী শহরের উপকণ্ঠে গয়েশপুরে অনুষ্ঠিতব্য বিবেকানন্দ যুব শিবির আক্ষরিক অর্থেই বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন। সমাজে এর প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে তাই-ই আমাদের আলোচ্য। রঙিন চিত্র সম্বলিত অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার এই সংখ্যাটি শুধুমাত্র যুব শিবিরে যোগদানকারীদেরই নয়, প্রতিটি বিবেকানন্দ-অনুরাগী মানুষের কাছেও সংরক্ষণযোগ্য।

*।। তারিখের মধ্যে কপি বুক করুন।। মূল্য ১০ টাকা।।*

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
14 January - 2013